কখনো আসেনি

রমাপদ চৌধুরী



ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮

প্রকাশক
মলয়েন্দ্রকুমার সেন
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা -১২

মুদ্রক
ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদশিল্পী
রণেন অয়ন দত্ত

দাম তিন টাকা

'কখনো আসেনি'র গল্পগুলি এর আগে অন্য কোন বইয়ের পাতায় কখনো আসেনি। বোধহয় আসেনি। 'বোধহয়' বলছি এই কারণে, যে একটি গল্প সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। সন্দেহ অকারণ নয় প্রতিপন্ন হলে সেটিকে ব্যতিক্রম রূপেই গ্রহণ করতে হবে। গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৪৫ সাল থেকে হালের দিন অবধি ছড়িয়ে আছে। কয়েকটির বিষয়বস্তু রচনাকালীন। সেই জীবন ও সমাজ এ ক'বছরে অনেক বদলে গেছে, সেই দিনগুলির কথা অনেকে হয়তো ভুলেই গেছেন। সুতরাং রসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তবে এ সঙ্কলনের কোন গল্পই পুরোপুরি কল্পনা নয়।

এই লেখকের

দরবারী

লালবাঈ

আপন প্রিয়

প্রথম প্রহর

অরণ্য আদিম

পিয়াপসন্দ

শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধাস্পদেষু

······এ বসন্ত কখনো আসেনি বুঝি আগে।

বনবাতাস

একটা লম্বা পাহাড়ের রেঞ্জ চলে গেছে রাঁচী থেকে রামগড়। জমাট বাঁধা কালো কালো পাহাড়। আর তারই সানুদেশ ঘিরে ঘন বনানীর বন্যা। এক পাহাড় আর আরেক পাহাড়ের মাঝে ছোট ছোট উপত্যকা। দেশী বিদেশী মানুষের বসতি সেখানে। দেহাতী গাঁও। ডেরা আর ডিহি। রেলপথের রাস্তাটা নয়। রাঁচী থেকে পালামৌ হয়ে ঘুরে এসেছে সড়কটা। মহুয়ামিলন, লাপরা, রায় হয়ে। পাহাড় ডিঙিয়ে, পাহাড় কেটে, পাহাড়ের গায়ে চক্র দিয়ে।

মহুয়ামিলনের ভেতর দিয়েও গেছে এই সড়ক। সড়কের গায়ে হেলানো ভগ্নশৃঙ্গ অনুপর্বত। মহুয়া-মাদার আর আমলকী-ইউকেলিপটাসের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় বাংলো টাইপের বাড়ি। উঁচু প্লিনথের ওপর সিমেন্টের রোয়াক আর টালির ছাদ।

এরই মধ্যে সবচেয়ে জাঁকালো বাংলোটির বারান্দায় প্রতি সন্ধ্যায় যে ভদ্রমহিলা বসে থাকেন, তিনিই আরতি দেবী! আজও ক্যানভাসের কেদারায় বসে জাফরি কাটা রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। এ সময়টা চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে। বেশ নিরুপদ্রব শান্তিতে কাটানো যায় এটুকু অবসর।

আজ কিন্তু বিরক্তি বোধ করছেন আরতি দেবী। ঠিক বিরক্তি নয়। এক বিরাট শূন্যতা যেন জেঁকে বসছে তাঁর মনে। ক্রমশ তাঁর কাছে দুনিয়ার সমস্ত আনন্দ-উচ্ছ্বাস যেন নিরর্থক হয়ে উঠছে। স্বামীকে ভালবাসতে পারেন নি বলে দুঃখ ছিল না তাঁর। বরং

গর্ব ছিল। সামাজিক প্রয়োজনের অঙ্গ ভেবে মেনে নিয়েছিলেন তাকে। অথচ আজ আবার নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। আশ্চর্য মানুষের মন। একটা লোকের অভাব, বিশেষ করে যে স্বামীকে ভালবাসেন নি কোনদিন, সেই স্বামীর অভাব গভীর ভাবে অনুভব করতে হচ্ছে। মনোতোষের মৃত্যুতে এমন ভাবে নিঃস্ব হয়ে যাবেন তিনি—আশঙ্কারও অতীত ছিল।

বাতাস নীলচে হয়ে আসছে। আর একটু পরেই চাঁদ উঠবে, অজস্র তারাও। নীলাভ রেশমী শাড়ীতে জ্বলবে অগণিত রূপালী চুমকি। দূরের পাহাড়ী বনটায় হয়ত ছুটে আসবে মৃগমাতৃকার দল। চিত্রিতা হরিণীর সারি সরল সারঙ্গ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখবে আকাশ আলোর বন্যা। ছলছলিয়ে উঠবে টুংরী নদীর জল।

গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে নড়ে চড়ে বসলেন আরতি দেবী।

বহুক্ষণ থেকে একটা করুণ সুর কেঁপে কেঁপে ভেসে আসছে। অবিরাম গতিতে ছন্দিত হচ্ছে বাঁশের বাঁশীর মিঠে মেঠো সুর। ক্লান্ত নটীর নূপুর নিক্কণের মত সে সুর ককিয়ে ককিয়ে ভেঙ্গে পড়ছে।

হঠাৎ ভেঁপু আর ঢোলক বেজে উঠলো উদ্দাম হয়ে। আগুন জ্বলছে। আগুন জ্বালিয়ে জলসা জমাচ্ছে ওঁরাও আর মুণ্ডার দল। ওরা নাচবে, গাইবে। মনমাতালের দল মহুয়া রসের দেহাতী হাঁড়িয়া খেয়ে নেশায় চুর হয়ে থাকবে। মাতলামি করবে।

কালো মেঘের বোরখা তুলে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ঘষামাজা রেকাবিখানা। জ্যোৎস্নার প্লাবন নামছে। জোয়ার উথলে পড়ে আলোয় পৃথিবী ভাসিয়ে দেবে এখনি। অনতিপ্রস্থ টুংরী নদীর ওপর কংক্রিটের সাঁকোটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এক জোড়া তরুণতরুণীর ঝাপসা চেহারা চোখে পড়ল আরতি দেবীর। অনু আর সুস্মিতা। অবাধ আনন্দে মশগুল হয়ে

বিশ্রম্ভালাপে মেতে রয়েছে ওরা। সাঁকোর শেষে বেদীটার ওপর বসে আছে দু'জনে। সুস্মির বুকে মাথা এলিয়ে দিয়েছে অনু। সিল্যুটের ছবির মত ঝাপসা হলেও বুঝতে পারলেন আরতি দেবী।

কথার ফাঁকে ফাঁকে খিলখিল করে হেসে উঠছে সুস্মি। দু'এক টুকরো হাসির রেশ ছিটকে কানে আসছে। সশব্দ হাসি। খুব তীক্ষ্ণ আর খুব গভীর। মাঝরাতে কাঁচ ভাঙ্গার মত ধারালো আওয়াজ। ভাল লাগে না আরতি দেবীর। এ হাসি কোনদিনই ভাল লাগে নি তাঁর।

মনে পড়ে। তাঁর কুমারী জীবনেও এ হাসি শুনেছেন তিনি। আজকের মত অসুখী ছিলেন না সেদিন। তবু ভাল লাগে নি এ হাসি। বিবাহপূর্ব জীবনে প্রতিবেশী নবদম্পতির ঠিক এমনি ধরনের উচ্চকিত হাসি সহ্য করতে পারতেন না তিনি। আজও পারেন না।

অনুকে আর আপন ভাবতে পারেন না আরতি দেবী। আর সুস্মিতা—সুস্মি অসহ্য। যেন জাতবৈরী। ওদের উল্লাস, আমুদে-আহ্লাদ অপমানের বিষ ঢুকিয়ে দেয় তাঁর মনে। মন বিষিয়ে তোলে। অথচ এই অনুকে নিজের হাতে মানুষ করেছেন তিনি। না। অনেক ভেবেছেন, অনেক জাগর রাতের চিন্তাক্রান্ত চোখে ভবিষ্যৎ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। না। এভাবে এদের সৌভাগ্যের মাঝে টিকতে পারবেন না। পাগল হয়ে যাবেন কোনদিন। এই সুখাতিশয্যের পরিপার্শ্ব শোককাতর করে তুলছে তাঁকে। অসহ্য। রাত বেড়ে চলেছে, এখনো ফেরবার নাম নেই ওদের।

যাক্। যখন হোক ফিরবে ওরা। আর অপেক্ষা করতে পারেন না।

কেদারা ছেড়ে উঠে পড়লেন। ধীরে ধীরে বিছানার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

দেয়ালের বড় আয়নায় অনেকক্ষণ ধরে নিজের প্রতিচ্ছবিটা দেখলেন আরতি দেবী! যৌবন এতটুকুও ক্ষয় হয়নি এখনো। সমাপ্তি ঘটেনি সৌন্দর্যের। নিজেকে, নিজের দেহকে বড় বেশী ভালবাসেন আরতি দেবী।

মনোতোষ মারা গেছে। বিধবা হয়েছেন। বেশ কয়েকমাস কেটেও গেল। কিন্তু থান কাপড়ের কাপট্য দিয়ে নিজের মনকে ছদ্মবেশ পরাতে পারেন না তিনি। না, সৌন্দর্য নষ্ট করা চলবে না। এমনি সাদাসিধে কালোপাড় শাড়ী অন্তত পরবেন জীবন-ভোর। ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুর জন্য নিজের সমস্ত ইচ্ছা অনিচ্ছার মৃত্যু ঘটানো চলবে না।

তৃপ্তি নেই। শান্তি পান না আরতি দেবী। মনোতোষকে তো কোনদিনই ভালবাসতে পারেন নি। তবু, কেন জানি নিজেকে বড় বেশী ব্যর্থ মনে হয় আজ। নিঃস্ব মনে হয়। চারিদিক ফাঁকা। পৃথিবী ফাঁকা। সমগ্র বিশ্ব যেন ফাঁকা।

বিছানার ওপর শুয়ে পড়লেন আরতি দেবী। সাটিনের কালো চাদরটা আঁকড়ে গুটিয়ে ধরলেন দু'হাতে। দু'হাত এলিয়ে দিয়ে বিছানার স্পর্শ নিলেন। বড় ঠাণ্ডা আর বড় নরম। বাঁহাতের ঝাঁকানি দিয়ে শিয়রের জানালাটা খুললেন। এক দমকা জ্যোছনা ঢুকল ঘরে। সারা দেহে তাঁর রূপালী রঙ মাখিয়ে দিল। চোখ বুজলেন। মুদিত চোখেই দু'পাশে হাত বাড়িয়ে কি যেন খুঁজলেন।

একান্ত একা। প্রেম, ভালবাসা? ভাল নাই বা বাসলেন মনোতোষকে। অভ্যাসের অভিসারে নিজের ব্যথিত জীবনকে রসিয়ে তুলতে তো পেরেছিলেন। তাছাড়া আনন্দও ছিল। একটা অদ্ভুত আনন্দ। আত্মগর্বের জয়-সঙ্কেত। ভাল না বাসার গর্ব ছিল নিজের মনে। ভালবাসা পাওয়ার ছদ্মবেশ দেখাতে

পারতেন বাইরের জগতকে। অকল্পেয় সুখের মুখোশ ছিল মুখে। আশ্চর্য খুশির আমেজ, হোক্ ভান।

উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়। দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরা যেন উন্মুখ আগ্রহে বিদ্রোহের পল গোনে। তৃপ্তিকামী উন্মাদ শিহরণ। ভয়, আশঙ্কা। হয়ত অপবাদ কুড়োতে হবে সেই ভয়।

নিজের মনেই হাসলেন আরতি দেবী। আজ অপবাদের ভয় হয়! অথচ একদিন নিঃশঙ্ক চিত্তে স্ব-ইচ্ছার অনুসরণ করেছিলেন।

তখন বয়স ছিল কম। কিন্তু বয়সের অনুপাতে দুর্নাম জমেছিল অনেক বেশী। অবশ্য কারণ ছিল তার পিছনে। কারণ—তাঁর রূপের ঝিলিক, তাঁর চোখের ঝলসানি! চোখের তারায় তারায় আশ্চর্য এক জলুস—ভাঙা বিদ্যুতের মত এক চাঞ্চল্যে ঝিকিয়ে ওঠে। পদ্মপল্লবের মত চোখের পাপড়ি নয়, নয় মৃগনয়নতুল্য টানা টানা চোখ। আসলে তাঁর চোখের দৃষ্টিটা ছিল সে বয়সে বড় চপল। নীল নয়, নিকষ কালো। পুরুষের চোখে চমকে উঠত লোভের ইশারা। হয়ত আজও ওঠে।

ষোল বছর পূর্ণ হতেই অঙ্গবৈভব ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছিল। চমৎকার গলা ছিল তাঁর গানে। পুরুষের মনে ব্যথা দিত তাঁর গানের মিঠে সুর। চোখের আবিষ্ট চাউনি আর গানের অপূর্ব রেশ যেন সমান তালে চমকে দিতো মানুষকে। আত্মদানের ভঙ্গিমা প্রতিটি ব্যবহারে। বিলুপ্তির নিশ্চিত নিশানা। মনে হত, পুরুষকে বাধা দেবার মত শক্তি বা ইচ্ছা কোনটাই বোধ হয় ছিল না তাঁর।

এ হেন আরতি দেবীর বিয়ে হল মনোতোষের সঙ্গে। রাঁচীতে মস্ত কারবার। চেহারা বাঙ্গালী পুরুষের মধ্যে সুলভ নয়। বিয়ে সে এর আগেও একবার করেছিল। বছর আষ্টেক আগে একটি

পুত্রসন্তান রেখে স্ত্রী মারা যায় মনোতোষের। তারপর থেকে মনের গহনে স্বর্গীয়া স্ত্রীর স্মৃতি পুষে দিন কাটাচ্ছিল মনোতোষ। অনুকে মানুষ করার ব্রত নিয়ে আটটা বছর কাটিয়ে এসে হঠাৎ একদিন মর্জি বদলে গেল তার। আরতি দেবীর বিয়ে হল এ হেন মনোতোষের সঙ্গে।

প্রথম যেদিন এখানে আসেন আরতি দেবী—আজও মনে পড়ে তাঁর।

আজ অতিপরিচয়ে নিরস হয়ে উঠলেও মহুয়া-মিলনের ঐ ছোট প্ল্যাটফর্ম অপরিচয়ের চোখে অনেক, অনেক রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছিল।

পুবে পশ্চিমে চলে গেছে এক জোড়া রেললাইন। কে যেন বিছিয়ে রেখেছে একখানা শাড়ী, আর দিনের আলোয় ঝকমকিয়ে উঠেছে তু'পাশের রূপালী জরির জমাট পাড়।

মহুয়ামিলন। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ চেয়ে চেয়ে দেখেছিলেন আরতি দেবী। নাম সার্থক করে নব উন্মেষিত উপনিবেশের গায়ে গজিয়ে উঠেছে অঢেল অফুরন্ত মহুয়ার বন। ধূসর বাতাস তখন সাঁঝের ঘোমটা টেনে দিচ্ছে পশ্চিমের রক্ত মেঘে। আর লাল কাঁকরের সর্পিল রাস্তা বেয়ে ছুটে চলেছে মনোতোষের গাড়ি। আরতি দেবীর পাশে মনোতোষ। অদ্ভুত এক শিহরণ জাগছে নববধূর মনে। নতুন এক অভিজ্ঞতা।

বনে বনান্তে শ্যামলিমার ছাউনি ফেলেছে অজস্রপল্লব মহুয়ার ভিড়। চারপাশের আবহাওয়ায় ভেসে আসছে উচ্ছ্বাসের স্রোত। চাঁপা রঙের মহুয়া জমেছে গাছে গাছে। নেশার আমেজ, মিঠে সুগন্ধ। রসালাপে আনন্দবিভোর মত্তমধুপের গুঞ্জন। ক্ষীণতটা টুংরীর ক্ষয়িষ্ণু স্রোতে নুড়িতে নুড়িতে লাগে স্পর্শ। জলোচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে স্তিমিত সঙ্গীত। টুংরীর বুকে কংক্রিটের

সাঁকো। মাদলমৃদঙ্গের তালে তালে ওঁড়াও মুণ্ডাদের নাচ আর গান।

আরতি দেবীর আজো মনে পড়ে।

বাড়ির সামনে লাল সিমেণ্টের উঠোনে পাশাপাশি দু'খানা বেতের কেদারায় বসেছিলেন তাঁরা। মোহমুগ্ধ চোখে নবপরিণীতা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিল মনোতোষ। আর আরতি দেবীর ঠোঁটে কৌতুকের হাসি। অনভ্যাসের কৌতুক। হাসি পেয়েছিল আরতি দেবীর। মনোতোষের চোখে মুখে কৃতজ্ঞতার ইঙ্গিত দেখে। সবেতেই যেন আরতি দেবীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা। ভালবাসা, প্রেম—কত কি স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছিল হয়ত। অথচ আরতি দেবী সেদিনও জানতেন, এই মনোতোষই আট বছর ধরে প্রথম পক্ষের মৃত সহধর্মিণীর স্মৃতি পুষে কাটিয়েছে। হাসি পেয়েছিল তাঁর, তবু চোখের দৃষ্টিতে মোহমুগ্ধ সুতৃপ্তির প্রলেপ এঁটে রেখেছিলেন।

আজো মনে পড়ে আরতি দেবীর।

আয়ার সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরল অনু। আট বছরের ছেলে অনু।

আয়া পুরনো কর্তা ও নতুন কর্ত্রীঠাকুরুণকে সেলাম জানিয়ে অনুকে তাদের সামনে রেখে চলে গেল। ছেলেকে কাছে টেনে আনলে মনোতোষ।

লজ্জার হাসি হেসে বললে, এই অনু।

উল্লসিত আনন্দে তাকে কোলে টেনে আনলেন আরতি দেবী। বললেন, এস অনু, তুমি আমার কাছে এস।

উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন অনুকে। আট বছরের কিশোর অনু নেহাত ছেলেমানুষ নয়। অনভ্যস্ত আদরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল সে। মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই আরতি দেবী বিপর্যস্ত করে তুললেন তাকে। কোলে বসিয়ে, অনুকে বুকের

কাছে চেপে ধরে, তার রেশমের মত পাতলা চুলের ভেতর ধীরে ধীরে আঙ্গুল চালিয়ে, তার গাল টিপে অস্থির করে তুললেন তাকে। আট বছরের অনু লজ্জায় মাথা নীচু করে সব অত্যাচার সহ্য করে গেল।

আবতি দেবী হেসে উঠে বললেন, লজ্জা করছে, না অনু? এর পর কিন্তু লজ্জা করলে চলবে না। কেমন?

অনু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে। চোখ তুলতে পারলে না।

--আমি তোমার কে জান তো?

অনু উত্তর দিলে না। এত আদর পাওয়ার পর আন্দাজে বলতে গিয়ে একটু ভুল সম্বন্ধ বলে ফেলার আশঙ্কাতেই হয়ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—কে বল, আমি তোমার কে?

পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে অতিষ্ঠ হয়ে অনু বললে, খুব আস্তে আস্তে বললে, মাসীমা।

সশব্দে হেসে উঠলেন আরতি দেবী। অনুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার চুলে চুমু খেয়ে বললেন, দূর বোকা ছেলে। আমি তোমার মা, নতুন মা। বুঝলে?

চম্‌কে চোখ তুলে তাকালে অনু।

হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলেন আরতি দেবী। মনোতোষেব কাছে অভিনয়টা হয়ত অভিনয় বলেই মনে হবে। তাঁর ব্যবহাব, তাঁর স্নেহাতিশয্য, তাঁর কথা হয়ত বিসদৃশ ঠেকবে মনোতোষেব চোখে। অপরিচিত অনুর সঙ্গে এতটা অন্তরঙ্গতা যে নেহাত মায়ের উপদেশ মানার ফল তা হয়ত বুঝতে পারবে সে।

আরতি দেবীর আজো মনে পড়ে।

আশ্চর্য। সেদিন মোটেই মনে হয়নি যে পরবর্তী জীবনের নির্জন মধ্যাহ্নগুলো একমাত্র অনুই তাঁর কাছে সজীব করে তুলবে।

আর মনোতোষ ? ভালবাসতে পারেন নি সত্যি, কিন্তু অভ্যাসের আওতায় পরের পরের দিনগুলোতে মনোতোষকে ভাল লেগেছিল তাঁর নিঃসন্দেহে।

একটা দিন।

খাটের ওপর নরম বিছানায় শুয়েছিলেন আরতি দেবী। মনোতোষ হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। আরতি দেবীর পিঠে আলগোছে হাত রেখে কি যেন বলছিল মনোতোষ। সেই শায়িত অবস্থাতেই আঁচল টেনে মুখ ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছিলেন আরতি দেবী।

—ভারি লাজুক তুমি। মনোতোষ বলেছিল। মুখের ওপর থেকে আঁচল সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, তাকাও তুমি, আমার মুখের দিকে তাকাও।

মনোতোষের চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করে অপূর্ব এক হাসি হেসেছিলেন আরতি দেবী। লজ্জা-রঙিন হাসি। চোখের ওপর হাত আড়াল রেখে ঠোঁট টিপে টিপে হেসেছিলেন।

মনোতোষ তাঁকে কতখানি অধিকার করেছিল, আজ তার মৃত্যুর পর বুঝতে পারেন আরতি দেবী।

সে ছিল কাজের মানুষ। বেশীর ভাগ সময় থাকত বাড়ির বাইরে। সে নির্জনতা সহ্য করতে পারতেন না আরতী দেবী। ক্রমে অনুর ওপর তাঁর স্নেহের পরিমাণ বাড়তে শুরু করলো। শেষে একদিন দেখলেন অনুর প্রতি তাঁর মায়ামমতা সম্পূর্ণ নিখাদ। নিজের ছেলেকে মানুষ যতখানি ভালবাসতে পারে অনুকেও তিনি ততখানি ভালবাসতে পেরেছিলেন। শুধু তাঁরই তত্ত্বাবধানে আট বছরের অনু আজ বাইশ বছরের পূর্ণযৌবন অনুতে পরিণত হয়েছে। চোদ্দ বছরের সেবা আর যত্ন মাখিয়ে গড়ে তুলতে হয়েছে, তারপর সুস্মিতাকে খুঁজে বের করেছেন

নিজে। অমুর বিয়ে দিয়েছেন। দিনগুলো তখন সুখে টইটম্বুর। জীবনের চারিধার থেকে সমস্ত আনন্দকণিকাগুলো যেন জমাট বেঁধে পেয়ালা ভরিয়ে তুলছে। খুশিতে উথলে পড়ছে পেয়ালা।

এমন সময় মনোতোষ মারা গেল।

একটা সজোর ধাক্কা লাগল আরতি দেবীর নরম বুকে। এতদিন নিজেকে অসন্তুষ্ট আর অসুখী মনে করে এসেছেন, সত্যিকারের দুঃখকষ্টের স্বাদ পেতে শুরু করলেন এবার। সরল-রেখার মত জীর্ণদিনের গতিশীল অভ্যাস যেন অকস্মাৎ মোড় ঘুরিয়ে দিলো জীবনের। সমস্ত পৃথিবীর আলো আর হাওয়া টেনে নিঙড়ে বের করে নিয়ে গেছে মনোতোষ। তাই আরতি দেবীর চোখে বিশ্বসংসার হয়ে উঠেছে বোবা আর ফাঁকা। একটা সান্ত্বনা ছিল এতদিন। আরতি দেবী যে অসুখী তা জানতে পারে নি কেউ। আজ যেন নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেছেন তিনি। আজ যে শুধু খুশি হবার উপায় নেই তাই নয়, খুশির ছদ্মবেশ আঁটবারও উপায় নেই।

মাঝে মাঝে বিগত দিনের ইচ্ছাটা জেগে ওঠে। জেগে ওঠে বিবাহ-পূর্বের সেই তরুণী। উচ্ছৃঙ্খলতার আগুন তাতানি লাগায় সমগ্র স্তিমিত চেতনার স্তরে স্তরে।

অনুভব করেন। অথচ কেমন যেন অবোধ্য।

চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবনে একদিনও তো কৈ যৌবন এমন ভাবে তাঁর শিরায় রোমাঞ্চ ছড়িয়ে দেয়নি। বোধ হয় যৌবন নির্বাসিত হতে চলেছে তাঁর দেহ থেকে। গ্রহণ-পূর্ব রাতের চাঁদের ঔজ্জ্বল্য হয়তো এটা। কে জানে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিতে চলেছেন কিনা। কে জানে।

রক্তে দোলা লাগে, রক্ত নেচে ওঠে, মাতিয়ে তোলে দেহ আর মন। বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা করে—বাঁধা ধরা নিয়মের বিরুদ্ধে,

রীতিনীতির বিরুদ্ধে। আর আহ্লাদী সুস্মির সৌভাগ্যের বিরুদ্ধে।

কিন্তু বিশেষ একটা সংস্কার ক্রমাগত আঘাত করছে তাঁব ইচ্ছার দেওয়ালে। মাসানুমাসিক অভ্যাস বাসা বেঁধেছে তাঁব মজ্জায়। নিস্তাব নেই।

যৌবনারম্ভের বিপ্লবী রক্ত সামাজিক বন্ধনেব মধ্যে এতদিন কাটিয়ে এসে আজ সম্পূর্ণ ঢিলে দিয়েছে। তাই সুস্মিব আনন্দ দেখে বিরক্তি আব বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে ওঠে মগজেব প্রতিটি তন্ত্রী, মনেব প্রতিটি রন্ধ্র।

সবে তখন সকালী রোদের তেজ বাড়ছে।

ঘবে নির্জ্জনে বসে বসে আবতি দেবী কয়েকখানা ফাইল ঘাঁটছিলেন। ম্যানেজার সত্ত দিয়ে গেছে। ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্তব তেমন ভাল বোঝেন না। তবু মাঝে মাঝে দু'একটা ছুটকো প্রশ্ন আব লম্বা সই টেনে ভড়ং বাখতে হয় মস্ত বড় বাণিজ্যচুম্বকেব। ম্যানেজাব অন্তত জানুক যে তাব কাজেব ওপর দৃষ্টি আছে আবতি দেবীব। চুবিব পরিমাণটা হয়ত কমাবে তা হলে।

লাইম ফ্যাক্টবীটাব একমাত্র স্বত্বাধিকাবী ছিল মনোতোষ। তাই আজ সব কাজই দেখতে হয় আবতি দেবীকে।

কাজ শেষ কবে উঠে দাঁড়ালেন এবাব।

ভিতবেব উঠোনে ঢুকলেন আস্তে আস্তে। স্নান কবতে হবে। ভোব বেলায় স্নান কবা এ বাড়িব বীতি।

ক্লান্ত বোধ কবছিলেন আবতি দেবী। আজকাল সামান্য কাজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

চৌবাচ্চা-ঘর থেকে সদ্য স্নান সেরে এসেছে অনু। উঠোনের এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেন আরতি দেবী। জলে ভাসছে সুগন্ধি সাবানের সাদা ফেনা। তোয়ালে বুলিয়ে গায়ের জল মুছছিল অনু। আরতি দেবী দাঁড়িয়ে দেখলেন। আপনা থেকেই তাঁর ঠোঁটের কোণে দুলে উঠল এক ফালি মিষ্টি হাসি। সম্পূর্ণ চোখে তাকিয়ে দেখলেন। অনুর সুন্দর দেহ। পেশী বহুল হাত। কাঁধের কাছটা কি মসৃণ! চওড়া বুক আর বিস্তৃত কপালে ক্ষুদকুঁড়োর মত বিন্দু বিন্দু জল। শীকরসিক্ত পুরুষদেহের অপরূপ সৌন্দর্য দেখছিলেন আরতি দেবী। মোহময় দৃষ্টি তাঁর চোখে। গর্বের ফল্গু বইছিল তাঁর মনের অন্তস্তলে।

হঠাৎ চোখ ফেরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল সুস্মির সঙ্গে। সুস্মিও দেখছিল অনুকে। তার লোভাতুর ঈষৎ অবনত তীর্যক চাহনিতে লজ্জিত হাসি। চোরা চাউনিতে দেখতে গিয়ে আরতি দেবীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার। লজ্জায় গাল রাঙিয়ে ছুটে পালালো সে।

সুস্মির ওপর মনটা বিষিয়ে উঠলো আরতি দেবীর। বিদ্বেষের বাষ্প ঠেলে উঠলো পাঁজরে পাঁজরে। ঈর্ষা? নিজের মনেই হেসে ফেললেন আরতি দেবী। অনু তারই হাতে গড়া মানুষ, চোদ্দ বছর অক্লান্ত সেবায় মানুষ করেছেন অনুকে। রতিপরিমাণ স্নেহ ভালবাসাও পুঁজি রাখেন নি বুকের কোণে লুকিয়ে। সেই অনুর নবপরিণীতা স্ত্রী সুস্মি। অথচ—

এই ভাবে দিনরাত অনু আর সুস্মিকে আমোদে মশগুল হয়ে থাকতে দেখলে গা জ্বলে যায় তাঁর। এদের মধ্যে সামান্যটুকু এক ব্যবধান আনতে পারলেও যেন মনে মনে খুশী হয়ে উঠতে পারেন।

অন্যদিন সুস্মিই কাছে বসে স্বামীর খাওয়ার সময়। পরিবেশনের ভার থাকে তারই ওপর। আজ তাকে অন্য

কাজ বাতলে দিয়ে পাখা হাতে কাছে এসে বসলেন আরতি দেবী।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন অনু দেখলে আরতি দেবী ওঠবার নাম করছেন না, তখন অতিষ্ঠ হয়ে বললে, কেন কষ্ট করছো মা, ওকে ডেকে দাও। দুপুর বেলাতেও তুমি যদি একটু বিশ্রাম না নাও—

আরতি দেবী বুঝতে পারলেন। বুকটা ব্যথিয়ে উঠলো। যে অনুকে চোখের সামনে তিল তিল করে গজিয়ে উঠতে দেখেছেন, সেই অনুর কাছে আজ আর তাঁর স্নেহ সেবা যত্নের কোন মূল্যই নেই। আট বছরের অনু বদলে গেছে।

উঠে এলেন আরতি দেবী।

আহার সেরে অনু ঘরে ঢুকতেই ঈষৎ গম্ভীর গলায় বললেন শোন, কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বেশ রূঢ় ভাষাতেই কিছু একটা বলবার ইচ্ছা ছিল, তবু কি এক অসামান্য দুর্বলতা তাঁর অনুর প্রতি, কিছুতেই কঠিন হতে পারেন না। অনুকে পাশে বসিয়ে তার পিঠে হাত রেখে ধীরে ধীরে কয়েকটা উপদেশ দিলেন। হাসি মুখে।

বললেন, তোমার তো আর এভাবে হৈ হৈ করলে চলবে না বাবা। অনেকদিন তো হয়ে গেল উনি মারা গেছেন। এবার তোমাকেই সব দেখতে শুনতে হবে, ম্যানেজারের ওপর বিশ্বাস করে বেশীদিন আর ফেলে রাখা কি উচিত ?

অনু হাল্কা হয়ে বললে, বেশ তো মা, কি করতে হবে বল না।

আদরের স্বরে আরতি দেবী বললেন, কারখানায় বেরুতে হবে তোমাকে। খাতাপত্তর দেখা, কাজকর্ম দেখা—

—বেশ তো। খাতাপত্তর দেখার কাজ আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে কিন্তু। কর্মচারীদের কাছে শিখতে পারব না আমি। অনু বললে।

হেসে ফেললেন আরতি দেবী।—কেন, লজ্জা করে বুঝি ?

আব্দারে গলে পড়ে মাথা হেঁঠ করলে অনু।

আরতি দেবী সান্ত্বনা দিলেন।—বেশ, আমিই শেখাব যতটা পারি। কিন্তু সব তো আমিও বুঝি না ভাল। বুদ্ধিমান ছেলে তুমি, ম্যানেজারের কাছে একটু দেখেশুনে নিলেই সব শিখে যাবে।

সম্মতি জানালে অনু। তারপর ঘব থেকে বেবিয়ে এলো সে, ধীরে ধীরে।

মনে মনে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি পেলেন আবতি দেবী। মুখে চোখে ফুটলো জয়ের অভিব্যক্তি। না, আজও সুস্মির মিষ্টি মধুর হাসি অনুর কাছে তাঁর অস্তিত্ব ভুলিয়ে দিতে পারে নি।

উত্তবের জানালাটা খুলে দিগন্তের দিকে চোখ মেলে তাকালেন তিনি। বকের পালকের মত সুশুভ্র আকাশ। খানিকটা ঠাণ্ডা রোদ্দুর পড়েছে বারান্দায়। দূরে পাহাড়ের পর পাহাড়, লম্বা চলে গেছে লাইমরেঞ্জ। দিকচক্রবালে মিশে গেছে। মহুয়ার কাঁচা পাতা, সবুজ ছোপ লেগেছে পৃথিবীতে। মাঝে মাঝে অনুর্বর উলঙ্গ পাহাড়ের অঙ্গ। নীলগাইয়ের মসৃণ দেহেব মত দেখায়। নীলচে রঙ—চাপা বেগুনী আভা ঐ নীলাভ পাথরের গায়ে। চুনের পাহাড়।

লাল পাথুরে জমিতে আমলকীর বন। সিরসিরে বাতাসে পাতা নড়ে। প্রজাপতির মত। রোদে চিকচিক করে সুপুষ্ট সুগোল আমলকী।

দুপুরের ভোঁ বেজে গেছে।

ক্যাঙারুর মত পা ফেলে ফেলে দ্রুত এগিয়ে চলেছে যত দেহাতী কুলিকামিন, রেজা আর রোজমজুরের দল। ওরা মধ্যাহ্নে আহার সেরে আবার কাজে চলেছে। একটু পরেই কারখানার

সাবধানী-ঘণ্টা বেজে উঠবে। ডিনামাইট পাথরের চাঙড় খসাবে। ভাঁটায় পুড়িয়ে সাদা করে দেবে নীল পাথর, মেশিনে ফেলে গুড়ো করে দেবে। তারপর ঘণ্টায় সাতটা ওয়াগন ভর্তি হয়ে সরে পড়বে এদিকে ওদিকে।

দূরের পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দেখেন আরতি দেবী।

মনোতোষের সৃষ্টি। মৃতস্বামীর বুকের সুর দিয়ে গাঁথা এক টুকরো অপূর্ব গীতিকা। নিপুণ শিল্পীর হাতের যুগসুন্দর চিত্র-নিদর্শন। প্রাণ ভরে তাকিয়ে দেখেন আরতি দেবী। বহু নির্জন মধ্যাহ্নে বেদনাব্যথিত চোখ মেলে দেখেছেন। আর প্রতিদিনই মনে হয়েছে এ দৃশ্য যেন চিরনূতন।

মনোতোষকে ভালবাসতে পারেন নি আরতি দেবী। মনোতোষের সৃষ্টিকে ভালবেসেছেন।

নিয়মিত কারখানায় যাতায়াত শুরু করে দেয় অনু।

সত্যিই। নিষ্কর্ম মধ্যাহ্নগুলো চুপ করে শুয়ে বসে সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে কাটাতে রুচিতে বাধত তরি। কাজ পেয়ে বেঁচে গেল। সকাল আটটা থেকে বারোটা অবধি, মাঝে দু'ঘণ্টা বিশ্রাম। দু'টো থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি আবার কারখানা। কাজ করার মধ্যে ডুবে গেল অনু।

তা বলে আনন্দালাপে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে নি।

অনেক রাত অবধি নানাদিকে দু'জনে ঘুরে বেড়ায় বনবাদাড়ে, নদীর তীর ধরে ধরে। দিনের অপ্রাপ্তিটা পুষিয়ে নেয়। কস্তুরী-মাতাল হরিণীর মত লাল মেঘের দিকে, সাদা চাঁদের দিকে ছুটে বেড়ায় সুস্মিতা। অনুর পিছনে পিছনে।

একটা ছোট ক্যামেরা কিনেছে অনু। বিকেলে দু'জনে যখন বেড়াতে বেরুলো, একখানা পুরোনো খবরের কাগজে সেটা মুড়ে

মায়ের চোখ ফাঁকিয়ে নিয়ে এলো অনু। পরপর অনেকগুলো ছবি তুললো সুস্মির, নানারকম ভঙ্গির। কখনও দাঁড় করিয়ে, কখনো বসিয়ে, কখনও সুস্মি যখন ছুটোছুটি লাফালাফি করছে তখন।

তারপর যখন ক্লান্ত বোধ করলে তখন সবুজ দূর্বা ঘাসের জাজিমে দেহ এলিয়ে দিলে ওরা।

রাত হয়ে আসে। আকাশে দেখা দেয় সোহাগী চাঁদ। ক্ষীণতটা টুংরীর ক্ষীণ সুরতরঙ্গ ভেসে আসে। সোঁ সোঁ করে খানিকটা ঝড়ো হাওয়া ঘূর্ণির মত পাক দিয়ে দিয়ে আকাশে উঠে শুকনো পাতা ছড়িয়ে ছুঁড়ে দেয়। ক্রমশ দমকা বাতাসের বেগ বেড়ে চলে। ধুলোয় ধুলোয় চারিদিক কুয়াশা-ভোরের মত ঝাপসা হয়ে ওঠে। জ্যোছনার গায়ে ময়লা ধরে।

কপট শঙ্কার ছাপ পড়ে সুস্মির মুখে। কাছে সরে আসে সে, অনুর গায়ে গা ঘেঁষে।

—ভয় করছে? সবল হাতটা সুস্মির পিঠের ওপর রেখে অনু প্রশ্ন করে।

উত্তর দেয় না সুস্মি। কান পেতে ঝড়ের শব্দ শোনে। বিভ্রান্ত চোখে চেয়ে দেখে ঝড়ের প্রলাপ।

—কি ভয় করছে? আবার প্রশ্ন করে অনু।

—হ্যাঁ। অনুর চোখের ওপর দু'টি গভীর শান্ত চোখ ফেলে মাথা নাড়ে সুস্মি।

—তবে চলো বাড়ি ফিরি।

—না।

দু'জনেই হেসে ফেলে। সশব্দে।

ঝড়ের মত্ততা আসে কমে। এক ফালি রাতের ছায়া এসে পড়ে ওদের ওপর। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে কালো-কাজল মেঘে ঢেকে গেছে চাঁদের মুখ। সাদা আকাশের গায়ে

আরো অনেক কালো মেঘ জমে ওঠে। সুরতাপ্লিত হস্তিনীর মত যেন গড়িয়ে নেমে আসছে মাটিতে।

বৃষ্টি নামবে হয়ত এখনি। জলো বাতাসের শীতলস্পর্শে দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সুস্মিকে বুকের কাছে টেনে নেয় অনু।

প্রতিদিনের মত আজও লাইমরেঞ্জের সার্চলাইটটা ক্রমশ ঘুরে চলেছে অবিরত। দূরে বৃষ্টি নেমেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি জলের ফোঁটা। ঝকঝকে বরফের কুচির মত। কৃত্রিম ফোয়ারার শীকরবিন্দুর মত ঝিরঝিরে জলের ফোঁটা চমক দেয়। সার্চলাইটের বিদ্যুৎ-আলোর ঝিলিক মেখে অজস্র জোনাকির মত দেখায়। আকাশ থেকে ঝরে পড়ে।

বৃষ্টি আসছে। ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে।

পালাবার সময় পেল না ওরা। ইচ্ছাও ছিল না হয়ত। মুহূর্তে ভিজিয়ে দিল দু'জনকে। ভিজে সপসপে শাড়ী লেপটে গেল সুস্মির দেহে। মোহমদির দেহরেখা হয়ে উঠল সুস্পষ্ট।

ক্যামেবার কেসটা ভিজে গেল। সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে হাত দিয়ে বাড়ির পথ ধরলে দু'জনে। এ ভাবে পাশাপাশি ভিজতে পায় নি তারা কোনদিন। আজ তাই চমৎকার লাগছে ওদের। এক অপূর্ব অনুভূতি।

এদিকে, মনে মনে সুস্মির ওপর চটছিলেন আরতি দেবী।

ইদানীং অনুর চেহারা খারাপ হয়ে আসছে, লক্ষ্য করেছেন তিনি। চোখদু'টো বসে গেছে। মুখখানা যেন রোগে ভুগে শুকিয়ে গেছে। তাঁর চোখের অনুবীণ দৃষ্টিতে মনে হয়েছে, কি যেন এক গভীর বিষাদের ছায়া লুকিয়ে থাকে অনুর চেষ্টাকৃত ম্লান হাসির আড়ালে। জীবনের মাধুর্যে টলমল কবত যে পেয়ালা, তাকে নিঃস্ব করে ছাড়বে সুস্মি।

একবার দুর্গা পুজোয় দরিদ্র ভোজন দেখেছিলেন আরতি দেবী। ছোটবেলায়। একটা কাঙালীকে খেতে দেখেছিলেন দু'বার করে, গোগ্রাসে। তা বলে সুস্মিতা কি এতদিন কাঙাল ছিল নাকি? নিজেকে খুব ভাল করে চেনেন বলেই নিজের জাতকে বিশ্বাস করেন না তিনি।

শব্দ শুনে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন আরতি দেবী। তাঁরই চোখের সামনে দিয়ে ভিজতে ভিজতে ফিবল অনু আর সুস্মি। মসৃণ ঘাড়টা চিকচিক করছে সুস্মির। বুকের ভাঁজে সাপটে লেগে আছে ভিজে শাড়ী। না, সুস্মিতা সুন্দবী নিঃসন্দেহ। সুঠাম সুডৌল নারীদেহ। এমন রূপসী পুত্রবধূকে তিনি নিজে খুঁজে বের করেছেন। মনে মনে গর্ব অনুভব করেন আরতি দেবী। এ সৌন্দর্যের বিনিময়ে একজনকে ধ্বংস করে কি আত্মতৃপ্তি পাবে সুস্মিতা। সুস্মির বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা চাগিয়ে ওঠে তাঁর মনে।

ডাকলেন তিনি সুস্মিকে।

বললেন, তোমাদের কি এতটুকু ভয়ডর নেই? বন বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় এত রাত অবধি?

হাসবাব চেষ্টা কবে সুস্মি বললে, ভয় কেন হবে মা? অপাঙ্গে একবার সে তাকিয়ে নিলে অনুর দিকে। হয়ত বোঝাতে চাইলে যে অনুর মত একজন, সুপুরুষ ব্যক্তি যখন তার দেহরক্ষী, তখন আর ভয় কিসের।

—গাছে গাছে মহুয়া পাকতে শুরু হয়েছে। দিনরাত মৌমাছি ভনভন করছে তা দেখেছ?

—বাঃ রে, মৌমাছিকেও ভয় কবতে হবে! নাকি সুবে আব্দারে গলে পড়ল সুস্মি।

ফিক করে হেসে ফেলেই গম্ভীব হলেন আরতি দেবী।—তোমার যেমন বুদ্ধি। মৌমাছি নয়, গাছে গাছে মৌচাক বাঁধছে

এখন। মহুয়া পাকলেই গাছে গাছে মৌচাক বাঁধে। আর এইবার দেখবে সন্ধ্যে হলেই বনজঙ্গল থেকে ভালুক আসবে দলে দলে। মধু খেতে।

—ওঃ ভালুক। তা আমরা তো অতদূর যাই না, মা।

ধৈর্য হারালেন আরতি দেবী। বললেন, দূর অদূর বুঝি না আমি, তোমার খুশি হয় যেও, অন্নুকে যেতে দেব না আমি কাল থেকে। এই তো আজ ভিজে এল, এরপর ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করুক একটা। দিনকে দিন কি চেহারা হচ্ছে।

মাথা নীচু করে সুস্মি বললে, বলছিল আজকাল নাকি কাজ বেড়েছে—

তাকে কথা শেষ করতে দিলেন না আরতি দেবী।—অন্নুই আজ প্রথম কাজে বেরুচ্ছে না। উনি অনেক বেশী খাটতেন, দিনরাত ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। রাতে ঘুমোন নি তবু একদিন একটু শরীর খারাপ হতেও তো দেখিনি।

সুস্মি মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ, তারপর ধীরে ধীরে সরে গেল তাঁর সামনে থেকে।

ঘরে আলো জ্বাললেও যে জানালাটা অন্ধকারে ঢেকে থাকে, তারই পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন আরতি দেবী। নির্জনে একটু ভাবতে চান।

জানালার পাল্লাটা ঈষৎ খুলে দিয়ে দাঁড়ালেন। মুখে চোখে এসে লাগল রেতো-বর্ষার ছাট। শীকরসিঞ্চনে উত্তপ্ত মুখটা ঠাণ্ডা হয়ে এল। গরাদের ফাঁকে গাল দু'টো চেপে আরো একটু বৃষ্টির জল মাখতে ইচ্ছা হল। আঃ সুস্মির মত আজো তিনি যদি হৈ হৈ করে ছুটে বেড়াতে পারতেন। সুস্মির মত যদি বনে বনান্তরে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ঘুরে বেড়াতে পারতেন! মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ভেতর দিয়ে কত স্বপ্ন-

ভ্রমণের প্রহর কাটিয়েছেন একদিন। হাউইয়ের মত ছুটতে চেয়েছিলেন, তারার পিছনে তারার মত। অথচ। অনেক ঝাপসা মুখ মনে পড়ে। বিয়ের পরেও হয়ত তার কল্পরাজ্য সার্থক হতে পারত। কিন্তু, মনোতোষ ছিল রীতিমত কাজের মানুষ।

তারপর। মনোতোষও মুছে গেছে। বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন আরতি দেবী। অনু, সুস্মি। আঃ, তাঁর দুঃখের এতটুকু যদি এরা বুঝত। তা হলে, তা হলে এতখানি নির্দয় হয়ত হত না। অভিমানে চোখ ঠেলে জল আসে। কাঁদতে ভাল লাগে আরতি দেবীর। অন্ধকার আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন। গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। নিস্তব্ধ কান্না গড়িয়ে পড়ে তাঁর চোখ বেয়ে। মনে মনে হাঁপিয়ে ওঠেন আরতি দেবী।

হাতের মুঠোর মধ্যে, গালের দু'পাশে ঠাণ্ডা গরাদের স্পর্শটা বেশ লাগে।

এদের কাছ থেকে যদি এতটুকু সহানুভূতি পেতেন। এত তীব্র ভাবে তাঁর চোখের সামনে নাইবা প্রকট করে তুলল ওদের সুখের উল্লাস। আজ যদি মনোতোষ বেঁচে থাকত—সুখ না হোক, সুখের ছদ্মবেশ তো রাখতে পারতেন সারা দেহে।

মনটা হাল্কা হয়ে এল। আঁচলে চোখমুখ মুছে ঘুরে দাঁড়ালেন এবার। না, কেউ লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ। তাঁর দুর্বল মুহূর্তগুলো ধরা পড়েনি। শুকনো হাসি হাসলেন আরতি দেবী। তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাবার সময় আছে নাকি ওদের।

উঁকি মেরে দেখলেন, বারান্দার ডেকচেয়ারটায় বসে কি একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে অনু!

পা টিপে টিপে পাশের ঘরে ঢুকলেন আরতি দেবী।

বেশ পরিবর্তন করছিল সুস্মি। এখনো ভিজে শাড়ীটা

জড়িয়ে রয়েছে তার দেহে। চোখের নীচে দুটি সজল রেখা—সেও বোধ হয় কাঁদছিল এতক্ষণ।

আরতি দেবী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। আয়নার মধ্যবর্তিতায় চোখাচোখি হতেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল স্নিগ্ধ, পালাবার পথ খুঁজলে।

—শোন।

ফিরে দাঁড়াতে হল।

—ছোটঘরের খাটখানা কাল আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিতে বলো। কাল থেকে তুমি আমার কাছে ও ঘরে শোবে।

কথা শেষ করে এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না আরতি দেবী। খাবার হয়েছে কিনা খোঁজ নিতে গেলেন।

অনেকক্ষণ অবধি ঘুম আসে নি তার। অনেক দুশ্চিন্তা ঘুরছে মাথায়।

আয়নায় দেখেছেন নিজের চেহারা। দেখে নিজেই আঁতকে উঠেছেন। এ কি! দুটো গহ্বরের মধ্যে কাচের মার্বেলের মত ঝাপসা চোখ। তাঁর সেই পুরুষমনোহারী চোখজোড়া আজ এমন হয়ে গেছে? যেন তেজ নেই, আনন্দ নেই, জীবন নেই।

ভাবতে ভাবতে কখন বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কখন।

মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল আরতি দেবীর।

বিছানায় উঠে বসলেন। কেমন যেন একটা নিঃস্ব বাতাস থেকে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে বুকে। বুকের ব্যথা ফেনিয়ে উঠতে চায়। কিছু একটা ভাবতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কিছুই যেন মনে পড়ে না। ছটফট করতে ইচ্ছা হয়। ছুটে বেড়াতে চান উন্মাদের

মত। সমস্ত বুকটা যেন ফাঁপা হয়ে গেছে। বুকের ভেতর থেকে কে যেন এক মুঠো মাংস তুলে নিয়েছে। অসহায়, নিঃস্ব, নিঃশেষিত। বালিশেব ওপব মুখ গুঁজে ঠাণ্ডা উপাধানের পরশ নেন। এ পাশ ওপাশ করেন। ঘুম আসছে না আর, ঘুম আসছে না।

চোখ বুঁজে কল্পনা কবেন, পাশেই মনোতোষ শুয়ে আছে। হাত বাড়িযে একটা বালিশ চেপে ধবেন। কল্পনা কবেন, পাশে শুয়ে আছে মনোতোষ। ওষ্ঠে ওষ্ঠ ছুইয়ে পাতলা কণ্ঠে কানে কানে কি যেন বলছে। ভালবাসা. প্রেম আবো কত কি। বঝলে, স্বর্গেও সুখ পাচ্ছি না আমি, তোমাকে ছেড়ে এসে। সত্যি, ভালবাসা? আচ্ছা, তোমাব খুব কষ্ট হয়, না! চলে এস, চলে এস লক্ষ্মীটি। আবো কাছে, আমাব বুকেব মধ্যে। অদ্ভুত আনন্দে শিউবে উঠলেন।

চোখ চেয়ে উঠে বসলেন আবাব। খাঁ খাঁ কবে উঠল বুকটা। না, স্বপ্ন বোমন্থন কবে লাভ নেই। যা হাবিয়েই গেছে। ফিরে পাবার উপায় নেই।

বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন আবতি দেবী।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে। বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে বহুক্ষণ। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আকাশে জ্বলছে কোটি কোটি তাবা। ভাঙ্গা চাঁদ চমক দিচ্ছে। কল্লোলিনী টুংবীব মিহি আওয়াজ আসছে ভেসে। কবরস্থানেব মত নিশ্চুপ পড়ে আছে সাবা বিশ্ব, কোথাও নেই এতটুকু আওয়াজের লেশ। শুধু টুংরী নদীব টুং টুং আওয়াজ। সম্মার্জনীব মত অন্ধকার মুছছে সার্চ-লাইটটা। অবিরত ঘুবছে।

আস্তে আস্তে বিছানায় এসে বসলেন আরতি দেবী। নিজের মনেই পা দোলাতে লাগলেন।

মনোতোষ। ভালবাসেন নি কোনদিন, তবু এত বাঞ্ছনীয় মনে হচ্ছে কেন আজ? অভ্যাসের তাগিদে? কে জানে।

কালো সাটিনের চাদরে হাতের উল্টো পিঠটা ঘষতে থাকেন আরতি দেবী। একটা ঠাণ্ডা কিছু স্পর্শ করতে ইচ্ছা করে। একটা শিশির-শীতল আবরণী যদি তাঁর দেহের উষ্ণতা ঢেকে দিতে পারত! একটা সুমিষ্ট সুরের বাঁশী যদি এমন সময় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিত।

আবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আরতি দেবী। ঔৎসুক্য আর আগ্রহ জেগে উঠেছে।

পা টিপে টিপে এগিয়ে এলেন। খুব আস্তে। নিঃশব্দে।

অনুর ঘরের জানালাটার কাছে এসে চুপচাপ দাড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে জানালার ফাঁকে উঁকি মারলেন এবার। পরমুহূর্তেই লজ্জায় কানের কাছটা ছমছম করে উঠল। চট্ করে সরে এলেন।

উষ্ণতায় জ্বালা করে উঠল চোখের কোণ দু'টো। আরতি দেবীর কালো কুরঙ্গনয়নে এক লোভার্ত আনন্দের আধিক্য চকচক করে উঠল।

ধীরে ধীরে নিজের বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়লেন আরতি দেবী।

পরের দিন আরতি দেবী যখন ঘুম থেকে উঠলেন বেলা তখন অনেক। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন রোদ বেড়ে উঠেছে। পুবের পথ অনেকখানি অতিক্রম করে এসেছে সজীব সূর্য।

তাড়াতাড়ি উঠে এসে মুখ হাত ধুলেন আরতি দেবী। তারপর বাইরের বারান্দায় ডেকচেয়ারটা খুলে বসলেন। ছোট্ট টুলের ওপর 'দৈনিক' দু'খানা পড়ে ছিল। দেয়াল ঘড়িটার দিকে

তাকালেন। শহর কোলকাতা নয় এটা, খবরের কাগজ আসে এখানে অনেক বেলায়। আরতি দেবী নিজেই বিস্মিত হলেন। লোক্যাল ট্রেনটা কখন চলে গেছে, ঘুমের ঘোরে টের পান নি।

বাংলা কাগজখানা টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে শুরু করলেন। বাচ্চা চাকরটা চায়ের ট্রে নিয়ে এসে রাখল। রেখে, ভেতরে চলে গেল সে। পরক্ষণেই অমু আর সুস্মি এল। সামনের কেদারাটায় বসল অমু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা পরিবেশন করলে সুস্মি।

কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকালেন আরতি দেবী।– তোমরা চা খাওনি এখনো ?

অমু ইংরেজী সংবাদপত্রটি তুলে নিতে নিতে বললে, তুমি ঘুমোচ্ছিলে যে।

আরতি দেবী হাসলেন।—চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমিও খুব বেশী আগে ওঠনি।

সুস্মি ভিজে চুলের রাশিটা মুঠো করে সামনে তুলে ধরে বললে, আমার কিন্তু অনেকক্ষণ স্নান হয়ে গেছে।

—তা'লে আর চা খাওয়ার প্রয়োজন নেই বল।

সুস্মি বললে, বাঃ রে, স্নান করে বুঝি চা খেতে নেই।

আরতি দেবী সহাস্যে বললেন, বেলা এগারোটার সময় খায়, না! আমরা এখনই উঠলাম তাই।

সুস্মি বাংলা কাগজটার একটা বিজ্ঞাপনের দিকে আঙুল দেখালে। দেখুন না, বলছে বেলা এগারোটায় এক কাপ চা হলে—

মৃদু হাসলেন আরতি দেবী। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে অমুকে প্রশ্ন করলেন, কাজে যাবে না আজ ?

যাব, উঠতে যে দেরি হয়ে গেল।

ওরা তিনজনে বসে কিছুক্ষণ আবোল তাবোল বকে গেল। তারপর এক সময় অমু উঠে গেল, সুস্মিরও সংসারের কাজে ডাক পরল। ভাঁড়ারের চাবি নিয়ে চলে গেল সেও।

খানিক পরেই আরতি দেবী দেখলেন, অমু বেরিয়ে গেল। অপস্রিয়মাণ তৈলযানটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

আস্তে আস্তে, এবার কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আরতি দেবী। স্নান সেরে নিতে হবে।

অনেক বেলা অবধি বিছানায় পড়ে থাকার দরুণ কেমন যেন অসুস্থ বোধ করছিলেন আরতি দেবী। তাই বহুক্ষণ পরে ঠাণ্ডা জলে স্নান করলেন। তারপর কাপড় বদলে ঘরে ঢুকলেন ধীরে ধীরে।

মুহূর্তে প্রতিটি শিরা যেন জ্বলে উঠল। ছুঁচ ফুটলো মগজের ভেতর।

দেয়ালে টাঙানো অমুর সুন্দর আবছা ফোটোগ্রাফটার দিকে অনিমেষ নয়নে স্নুস্মি তাকিয়ে রয়েছে। হতচেতন তন্ময় ভাব তার চোখে মুখে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

গা জ্বালা করে উঠল আরতি দেবীর। প্রেম তিনিও করেছেন, ভালও বেসেছেন। তাঁরও স্বামী ছিল একদিন। আর সে স্বামীর ভালবাসাও পেয়েছিলেন। কিন্তু কোনদিন ক্ষণিকের অনুপস্থিতিতে বিরহযাপন তো অসহ্য হয়ে ওঠেনি! সুস্মির এই স্বামীর প্রতি অতিরিক্ত অনুরক্ত হওয়াটা স্ত্রৈণ পুরুষের ব্যবহারের মত ক্লেদপঙ্কিল মনে হয় তাঁর। সহ্য করতে পারেন না।

গতসন্ধ্যার আদেশটা তাই আবাব মনে পড়ে গেল তাঁর।

চাকরটাকে ডেকে সুস্মির সামনেই বাড়তি সিংগেল বেড খাটখানা তাঁর নিজের ঘরে আনালেন। সুস্মিকে বললেন, এখন থেকে তোমার বিছানাপত্তর আনিয়ে ব্যবস্থা করে রাখ।

আর কিছু বলতে হল না। সুস্মি বুঝতে পারল।

দুপুরে অনু যখন আহাবে বসল, অনেক চেষ্টা কবে লজ্জায় নবব্যবস্থাব কথাটা বলতে পারল না সে। সন্ধ্যাব সময়ও সুযোগ পেয়েছিল, অনুর সঙ্গে নিরালা সঙ্গ পেয়েছিল, তবু বলতে পাবে নি। বাত্রিতে সুস্মি যখন আবতি দেবীব ঘবে শুতে এল, তখন আরতি দেবী দেখলেন সুস্মি গোপনে আঁচল চাপা দিচ্ছে চোখে।

আনন্দ পেলেন, শান্তি অনুভব কবলেন আরতি দেবী। জয়েব অভিব্যক্তি ফুটল ওর মুখে চোখে।

খানিক পবে সুস্মি টেব পেল আবতি দেবী ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওর ইচ্ছে হল নিঃশব্দে এ ঘর থেকে পালিয়ে যেতে। অনুব কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হল। কিন্তু সাহস হল না। চুপ কবে বিছানায় পড়ে পড়ে ভাবতে লাগল। ঘুমোবাব চেষ্টা কবলে। অন্ধকারে চোখ চেয়ে পড়ে বইল।

অনুবও ঘুম আসছিল না। পাশেব ঘবে একাকী শুয়ে শুয়ে ছটফট কবছিল সে। ঘুম আসে না, বিছানায় ছটফট কবে আব ভাবে তার নিবস ভাগ্যেব কথা। নিয়তিব চাকা ঘুবতে ঘুবতে যেন দুঃখেব ত্রিশূলফলাটা অনুবই বুকে এসে খোঁচা দিচ্ছে। এ যেন ঝড়েব আগে কালো মেঘ গুটিয়ে আসছে ক্রমশ।

নির্বিঘ্ন অভিমানেব কুয়াশা আচ্ছন্ন কবে ফেলে তাব সমগ্র চেতনা। পাজবে পাঁজবে গুমবে মবে বৈপ্লবিক আক্রোশেব নিষ্ফলতা। অভিশাপেব ছোঁয়াচ লেগে নিঃস্ব হয়ে আসে টলমল সুখেব পেয়ালা। নিঃশেষিত হয়ে আসছে তাব উচ্ছ্বসিত আনন্দের উৎসস্রোত।

স্তব্ধ নিশীথেব অন্ধকারে বালিশে মুখ চেপে বহুক্ষণ ভাবলে অনু। ক্রমশ তাব কাছ থেকে দূবে সবে যাচ্ছে সুস্মি।

আজ অনেক রাত অবধি আশায় আশায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে সে। শেষে আন্দাজে এবং অনুভবে টের পেয়েছে, পাশের ঘরে আরতি দেবীর কাছে শয্যা নিয়েছে সুস্মি। অভিমানের চোখ ছেপে জল আসছে তার। মার আদেশ? কিন্তু সুস্মি জানায়নি কেন তাকে।

তারপর। বহু চেষ্টা করেছে অনু। ঘুম আসেনি। শুধু অপেক্ষা করেছে। হয়ত সুস্মি আসবে। রাতের অন্ধকারে হয়ত লুকিয়ে চলে আসবে সুস্মি। অধীর আক্ষেপে প্রতীক্ষা করেছে সে।

কপাটের খিল্‌টা খুলে রেখে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রহর অতিক্রম করে চলে অনু।

অনেক রাত অবধি জেগে কাটিয়েছে সুস্মি। আড়-চোখে তাকিয়ে দেখেছে সে আরতি দেবীর নিদ্রিত মুখের দিকে। নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছে। ইচ্ছে হয়েছে ছুটে চলে আসতে, তবু পারে নি। সাহস হয়নি। ভয়, আশঙ্কা! শঙ্কিত বুকের স্পন্দন গুণে গুণে রাত কাটিয়েছে সে, কিন্তু আসতে পারেনি অনুর কাছে। ভয় হয়েছে। যদি জেগে ওঠেন আরতি দেবী। আর লজ্জা। তার অযাচিত অভিসার দেখে অনু কি মনে করবে। সারা রাত্রি অপেক্ষা করেছে অনুর দিক থেকে কোন শব্দের ইঙ্গিত ইশারা পাবার আশায়। রাত জেগেছে। কিন্তু অনু নিশ্চুপ, অনু নিঃশব্দ। জাগররাত্রি তার ব্যর্থ হয়েছে। ব্যথিত চিন্তায় কোন ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

ভোর হয়ে এসেছে। কাচের শার্সি ভেদ করে ঢুকেছে এক ঝলক রূপালী আলো।

কিসের একটা শব্দে চমকে জেগে উঠল সুস্মি। ঘুম টুটে গেল।

একটা তীক্ষ্ণ হাসির আওয়াজ। সকাল বেলাকার নিঃশব্দতা

ভেঙে গমকে উঠছে কাঁচ ভাঙার আওয়াজ। বাতাস চিরে চিরে একটা উন্মাদ হাসির ঝলক।

চকিতে ফিরে তাকালে সুস্মি। পরমুহূর্তেই বালিশে মুখ ঢেকে পড়ে রইল সে। ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। চোখ বুজে স্তম্ভিত বিস্ময়ে বোবা হয়ে রইল সুস্মি।

ভোর হয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে কেঁপে কেঁপে। আর সাদা আকাশ। শিশির ভেজা শ্বেতকমলের মত সাদা আকাশ। সমুদ্রের ফেনার মত ফুটফুটে ফর্সা আকাশ। গলানো সোনার মত এক মুঠো রাঙা মেঘ পুবের নীচু নভদিগন্তে। আঁকা বাঁকা টুংরী নদীর জল। চমক দিচ্ছে সূর্যের কিরণ লেগে। যেন এক ফালি ভাঙা বিদ্যুৎ। পাকা মহুয়ার মিঠে সুগন্ধ আনছে নেশার আমেজ। আমলকীর শাখায় শাখায় কচি সবুজ পাতার ঝালর। লাইমরেঞ্জের কুয়াশার ফাটা ফাটা চাদর ঝুলছে।

রসপিপাসু অন্নু তাকিয়ে থাকুক সেদিকে।

রতিবিলাসাকাঙ্খী কৃষ্ণসারিণীর মত তন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আরতি দেবী। দেয়ালের বড় আয়নাটায় নিজের বিস্রস্ত রূপ দেখছেন। আর হাসছেন। হাসির প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাচ্ছে নেচে নেচে। মাতালের হাসি। উন্মাদের হাসি।

নারীরত্ন

নারী যে রত্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু নীলার মতই এ-রত্ন ধারণ করলে উত্থান সন্দেহজনক, পতন প্রায় অনিবার্য।

কথাটা আমার নয়, একরামপুর জঙ্গলের থানা-হাকিম সুধীরবাবুর কাছে শোনা। সুধীরবাবু আবার কার কাছে শুনে স্রেফ নিজের অভিজ্ঞতা বলে চালিয়েছেন বলতে পারি না।

সুধীরবাবু অবশ্য এ-কথা বলেছিলেন তাঁর কথামৃতের দৃষ্টান্ত হিসেবে। যেদিন বলেছিলেন সে-দিনটাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু ভেবেছিলাম, এ-গল্প আমি কোনদিন লিখব না। এলাহাবাদ থেকে সুজাতা মল্লিক আমার গল্প সম্পর্কে কটাক্ষ করে চিঠি না লিখলে এ-গল্প আমি সত্যিই লিখতাম না। নিছক প্রেমের গল্প আমি কেন লিখি না, তার জবাবে সুধীরবাবুব গল্পটাই বলতে হয়। অথচ এমনি মুশকিল, যাদের নিয়ে গল্প লিখলে আপনারা বিরক্ত হন, সুধীরবাবুর গল্পটা তাদেরই নিয়ে।

কালী মণ্ডল কিন্তু বলেছিল "ও স্যার সব মেয়েমানুষই এক। নাম আর পোশাক বদলে আপনার শহুরে মেয়ে বানিয়ে দিলেও অন্যায় হবে না। ভাববেন না এ শুধু জংলা মেয়েদের কীর্তি।"

থানা-হাকিম সুধীরবাবু হেসে বলেছিলেন, "সেইজন্যেই তো বলি, নারী হল নরকের দ্বারী।"

"দ্বারী নয় স্যাব, গাড়ি বলুন। গড়গড় করে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেয় নরকের দরজায়।"

সুধীরবাবুর মত নারীবিদ্বেষী আমি এখনও দেখিনি। উনি

বলতেন, জ্ঞানবৃক্ষের আপেল খাওয়ার পর থেকেই নাকি স্বর্গের সঙ্গে আড়ি তাদের।

আপত্তি করে বলতাম "এ আপনার বাড়াবাড়ি। সব মেয়েই কি এক ?"

সুধীরবাবু হেসে বলতেন, "তা ঠিক। ক'টা মেয়ে আর দেখেছি আমরা, দু'একজন নিশ্চয়ই ভাল আছে। তবে মুশকিল হয় কি জান..."

বলে থামতেন সুধীরবাবু, আর আমরা উদগ্রীব হয়ে তাকাতাম তাঁর মুখের দিকে। বেশ বুঝতাম, একটা-না-একটা গল্প বলার জন্যে তৈরী হয়ে নিচ্ছেন সুধীরবাবু।

সেদিনও এমনিভাবে নারীচরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে সুধীরবাবু হঠাৎ বললেন, "মুশকিল কি জান, সব মেয়েদের তো আমরা ঠিক আগে থেকে চিনতে পারি না। এই যেমন ময়না কিস্কু।"

"সে আবার কে ?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

সুধীরবাবু উত্তর না দিয়ে হঠাৎ নিজেরই দাবনার উপর ফটাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। তারপর হাতটা চোখের সামনে ধরে বললেন, "মশা তো নয়, যেন এক একটা চড়ুই পাখি বোলতার হুল ধার নিয়ে এসে জুটেছে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। একরামপুর জঙ্গলের মশা একমাত্র একরামপুরেই দেখছি। শুধু মশা নয়, বৃষ্টিও। যে-বৃষ্টির আভাস পেয়ে নোয়াকে নৌকো বানাতে হয়েছিল, ঠিক তেমনি অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে তখন।

ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ একটা একটানা শব্দ শুধু।

আর রাতও তখন অনেক। সিপাইকুঠি তখন ঘুমে নিঃঝুম। বারান্দায় শুধু আমরা পাঁচটি প্রাণী। আমি অবনীবাবু, কালী

মণ্ডল, আর হৃদয় পাণ্ডে। চারিদিক অন্ধকার আর বারান্দায় একটা টিমটিমে লণ্ঠন ঘিরে একরাশ বাদলা পোকা।

যে ক'বছর ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতে হয়েছিল, সে-সময়টুকুর মধ্যে নানা বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু একরামপুরের মত জঙ্গল আর একটিও দেখিনি। জানালার গরাদ ধরে ভালুকে উঁকি মারে, চিতাবাঘ ঘুরে বেড়ায় যত্রতত্র, রাস্তায় হুডখোলা গাড়িটা নিয়ে বেরিয়েছ কি বনশূয়রের পাল তাড়া করে আসবে।

এ-হেন জঙ্গলের মাঝখানে একটা পাহাড়ের ঢালুতে সোনা-তুলসী নদীর পাড়ে বিঘে কয়েক জনারের খেত নিয়ে যে সোনাডি গ্রাম, সে গ্রামের লোকগুলোও ছিল বুনো।

সুধীরবাবু বললেন, "খুনজখম তখন হামেশাই লেগে থাকতো।"

একটু থেমে বললেন, "খাওয়াদাওয়া সেরে সবে শুতে যাব, বাইরে হল্লা শুনে বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি, দুটো মরদ আর একটা মেয়ে।

"জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার!

"উত্তর না দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করলে মেয়েটা। ধমক দিতে তবে চুপ করল।

"খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞেস করে বুঝলাম একটা খুনো-খুনি হয়ে গেছে।

"সঙ্গের মরদ দুটো একসঙ্গে বলে উঠল, 'থানা-হাকিম, এ-মেয়েটা হল ভুখন কিস্কুর বৌ ময়না কিস্কু।'

"খানিক পরেই সোনাডির জনকয়েক লোক ভোলা ধুলন টুডুকে ধরে নিয়ে এসে হাজির হল। আর ময়না কিস্কু মেয়েটার সে কী কান্না।

"কাঁদবে না ? ভুখন তো ওর স্বামী, খুনীটা ধরা পড়েছে বলে তো আর স্বামীর শোক ভুলতে পারে না ?

"কিন্তু থানায় কাজ করে করে ওসব মনের খবর আর রাখবার সময় থাকে কই। আমার তখন রাগ হল সোনাডি গাঁ-টার ওপরেই। বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি, অন্ধকার রাত। কোথায় দিব্যি আরামে ঘুমোব, তা নয়, চল কাদাজল ঠেঙিয়ে।

"খুন জখম কি কম দেখেছি এ-জীবনে। কিন্তু এমন কেস হাতে এসেছে খুব কম। গিয়ে দেখলাম ঘরের মেঝেতে ভুখনের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে কাটা ছাগলের মত, আর পাশে একটা টাঙ্গি।

"গাঁয়ের সর্দার কদম মানকি খুলে বললে সব। বললে, 'হুজুর, ময়না কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে জানাল যে, তার স্বামীকে টাঙ্গির এক কোপে সাবার করে দিয়েছে ধুলন টুডু।' "

সুধীরবাবু গল্প বলতে বলতে থামলেন হঠাৎ। বাইরে তখনও ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি আর অন্ধকার। সিপাই কালী মণ্ডল চুপচাপ শুনছিল এতক্ষণ। হঠাৎ বললে, "সেদিনের কথা মনে পড়লে স্যার এখনো হাত পা শিউড়ে ওঠে। আর মাগীটাও কী কান্নাই না কাঁদছিল।"

"ব্যাপারটা কি ?" উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম।

সুধীরবাবু জানালেন ইতিহাসটা। বললেন, "ময়নাই দেখিয়ে দিল চালটা, যে-জায়গাটা ফুটো করে ধুলন পালিয়েছিল। দেখলাম সত্যি তাই, ঘরের চাল ফুটো করে পালানোই বটে।"

"ময়নাও কান্না থামিয়ে বললে, 'হুজুব, খুনীটা যেই ভুখনের কাঁধে টাঙ্গির কোপ ঝেড়েছে অমনি কপাট বন্ধ করে আগল তুলে দিয়ে কদম মানকির কাছে ছুটে গেলাম। ভাবলাম ডাকুটাকে হাতেনাতে ধরা যাবে। কিন্তু ফিরে এসে যখন গাঁয়ের লোক কপাট খুলল তখন দেখি ধুলন খুনীটা নেই, শুধু দেওয়ালের গায়ে রক্ত মাখা পায়ের দাগ।' "

কালী মণ্ডল বললে, "কিন্তু পালাবে কোথায়, গাঁয়ের লোকই খোঁজাখুঁজি করে ধরে আনল ওকে।"

"তারপর ?" জিজ্ঞেস করলাম সুধীরবাবুর দিকে চোখ তুলে।

সুধীরবাবু হাসলেন।—"ময়না বললে সব। হরকরার কাজ করত ভুখন, নির্মল সিং মারা যাওয়ার পর ভুখন হয়েছিল রানার। সোনাডি থেকে বরকাডিহি মেল পৌঁছে দেওয়াই ছিল ওর কাজ। তা সেদিন রাত্তিরে ভুখনের লাঠির ডগায় ঘুঙুর বাজতে বাজতে সোনাতুলসী নদীটার ওপারে মিলিয়ে যেতেই ময়না কপাট বন্ধ করতে যাবে, এমন সময় নাকি হঠাৎ ধুলন এসে জাপটে ধরলে ওকে, জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতর এনে ফেলল।"

কালী মণ্ডল সুধীরবাবুর পিছনে গিয়ে একটা বিড়ি ধরাল, তারপর টিপ্পনি কাটল, "আমি হুজুর শুনে কিন্তু সেদিন দোষ দিইনি ধুলনকে। ময়নার বেটিকে দেখেননি ত আপনি। পনেরো বছরের একটা ডাগর মেয়ে তখন ময়নার, ওর নিজের বয়স তিরিশের কম নয়, কিন্তু অমন আঁটসাঁট গড়ন আপনি দেখেননি।"

সুধীববাবু হেসে বললেন, "তা কালী যা বলছে ঠিকই। ভেনাসের মূর্তিতে গোলা খয়ের লেপে দিলে যেমনটি হয়।"

বললাম, "বর্ণনা রাখুন। আসল কেসটা কী ?"

"কেস ঘোরালো না হলে আর বলছি কেন ? ময়না যা বললে, বুঝলাম ধুলন একটা লম্পট। ময়নার ওপর চোখ ছিল তার অনেকদিন থেকেই। সুযোগ পেয়ে সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল, এমন সময় ময়নার চীৎকার শুনে ভুখন হঠাৎ ফিরে এল।"

অবনীবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "একেই নিয়তি বলে। ওসময় কি কেউ মানুষ থাকে, পশুরও অধম হয়ে ওঠে। বাধা পেয়ে

তাই ভুখনের টাঙ্গিটাই কেড়ে নিয়ে যদি কোপ বসিয়ে দেয় ধুলন, ত দোষ দেবার কী আছে।”

সুধীরবাবুও সায় দিলেন। “আমরাও তাই দেখলাম। খুনীটাকে যত প্রশ্ন করি একটা কথারও জবাব দেয় না। চুপচাপ উদাস চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে শুধু।

“সাক্ষী প্রমাণের ঝঞ্ঝাট ও ব্যাটাই বাঁচিয়ে দিলে, জজের কাছে স্বীকার করলে সব। বললে ‘হাঁ হুজুর, আমিই কেটেছি ভুখনকে।’ বললাম না, নারী হল নরকের দ্বারী। তোমরা ত বিশ্বাস করবে না।”

বললাম, “বেশ লোক আপনি। এ-ব্যাপারে ময়নার দোষটা কী? বেচারীর আঁটসাঁট চেহারা ছিল এই বুঝি অপরাধ ওর।”

“আরে ছো।” হাসলেন সুধীরবাবু, “আমি কি তা ভেবেছিলাম নাকি? ধুলনের কথা ত ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা।”

কালী মণ্ডল সামনে এসে বসল আবার। বললে, “ময়নার ডাগর মেয়েটা হঠাৎ এসে হাজির না হলে ত আর মনেই পড়ত না ওদের। কী বলেন হুজুর।”

সুধীরবাবু ঘাড় নাড়লেন। “তা ঠিক। মেয়েটা হঠাৎ এক-দিন কাঁদতে কাঁদতে এল বলেই মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কাঁদছিস কেন রে বেটি?’

“তা মেয়েটা বললে, ‘হুজুর তুই হুকুম দে মানকির ওড়ায় থাকব আমি, ময়নাকে আমার ডর করে, ও ডাইনী।’ ”

সুধীরবাবু বললেন, “শুনে ত আমরা থ। মাকে ভয় পায় মেয়ে, মাকে ডাইনী বলে, এ আবার কোন-দিশী কথা। জিজ্ঞেস করলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

“তখন মেয়েটা বললে সব। বললে ‘হুজুর, ময়নার সঙ্গে সাথ ছিল ধুলনের।’ ”

"সাথ ছিল, বলিসনি ত এতদিন ?

'ডাইনীর ভয়ে বলতে পারিনি হুজুর।' কাঁদতে কাঁদতে বললে মেয়েটা।

"বললে, 'ভুখন মেল নিয়ে বেরিয়ে গেলেই হুজুর, আমাকে গিতিওড়ার ঘুমঘরে পাঠিয়ে দিত ময়না।' "

"তারপর ?"

"আমার কেমন সন্দেহ লাগত হুজুর। তা একদিন মাঝপথ থেকে ফিরে এসে দেখি ধুলনের সঙ্গে বসে গল্প করছে তোদের ময়না। তারপর থেকে রোজই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম হুজুর ধুলন আর ময়নাকে। ভাল লাগত না আমার, অথচ কিছু বলতে সাহস হত না। শেষে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না হুজুর, তোদের ভুখনকে বলে দিলাম সব।'

"তারপর ?"

"তোদের ভুখন কিন্তু কিছুই বলল না হুজুর, চুপ করে রইল। তারপর রোজের মত সেদিনও মেল নিয়ে বেড়িয়ে গেল। আর আমি গিতিওড়ায় না গিয়ে লুকিয়ে রইলাম, ধুলন কখন আসে। এমন সময় হঠাৎ দেখি, ধুলন নয় ভুখনই ফিরে এসেছে। শুনতে পেলাম ভুখন বলছে, এই টাঙ্গি রইল পাশে। আসুক ধুলন, তোর চোখের সামনেই তাকে টাঙ্গির এক কোপে শেষ করব।'

"'তারপর হঠাৎ একটা চীৎকার শুনলাম হুজুর। উঁকি মেরে দেখি ময়নার হাতে টাঙ্গি আর ভুখনের মাথাটা মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। দেখে, গলা শুকিয়ে গেল ভয়ে, ছুটে পালাতেও পারলাম না। এমন সময় ধুলন এসে হাজির হল রোজকার মত।'"

রুদ্ধশ্বাসে সুধীরবাবুর গল্প শুনছিলাম। বললাম, "সে কি সুধীরবাবু, ধুলন খুন করেনি ? আর ওরই ফাঁসি হয়ে গেল ?"

সুধীরবাবু হাসলেন। "তখন ত জানতাম না, আর ব্যাটা নিজেই যে স্বীকার করলে সব।"

বললাম, "কিন্তু স্বীকার করল কেন?"

সুধীরবাবু বললেন, "ময়নার মেয়েটাও তো বুঝতে পারেনি। শুধু বললে, ধুলনকে ফিসফিস করে কী সব বলেছিল ময়না। দেখিয়েছিল ভুখনের কাটা শরীরটা আঁতকে উঠেছিল ধুলন, বলে উঠেছিল, তুই খুন করেছিস ময়না, নিজের স্বামীকে খুন করেছিস?

"আর তা শুনে এক মুহূর্তে স্তম্ভিত হয়ে ধুলনের দিকে তাকিয়ে থেকে ময়না বলেছিল 'তোর জন্যই খুন করেছি ধুলন, তোকে বাঁচাবার জন্যেই খুন করেছি।'

"কিন্তু মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে সোনাতুলসীর জলে ভাসিয়ে দিতে রাজী হয়নি ধুলন। বলেছিল, না না এ-কাজ আমি পাবব না।'

"আর তা শুনে হঠাৎ ঘবের বাইরে বেবিয়ে এসেই কপাট বন্ধ করে চীৎকার করতে করতে ছুটে গিয়েছিল ময়না।"

বলে হাসলেন সুধীরবাবু বললেন, "প্রাণের মায়া ত সকলেরই আছে। ধুলন যখন বুঝল খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়বে, তখন চাল ফুটো করে পালাবার পথ দেখলে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আর সেটাকেই আমরা ভাবলাম প্রমাণ।"

বললাম, "কিন্তু জজের কাছে স্বীকার করল কেন ধুলন? সত্যি কথাটা বললে হয়ত ছাড়া পেত। নয় কি?"

সুধীরবাবু চুপ করে রইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কী জানি। তবে কেন স্বীকার করল জিজ্ঞেস করছ? স্বীকার করল হয়ত এইজন্যে যে ধুলন সত্যিই ভালবাসত ময়নাকে।

অবোধ্য ঠেকল কথাটা, তাই সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকালাম সুধীরবাবুর মুখের দিকে।

সুধীরবাবু মাথা নিচু করে রইলেন। মাথা নিচু করে বললেন "যাকে সত্যিই ভালবাসি, সে যখন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চায়, তখন মৃত্যু কামনা করাই ত স্বাভাবিক।"

বললাম, "তা সত্যি।"

বললাম বটে, কিন্তু বিশ্বাস হল না। না, সেদিনও বিশ্বাস হয় নি, আজও বিশ্বাস করি না সুধীরবাবুর গল্প, ময়না কিস্কুর গল্প।

কিন্তু আপনাদের কী মনে হয়? সত্যি হতে পারে এ-গল্প?

ঠগ

গ্রীষ্মের ছুটিতে মামাবাড়ি যাচ্ছিলাম। ভিড় ঠেলে কোন রকমে বাক্স বেডিং তুলে থার্ড ক্লাস কামরার এক পাশে একটু জায়গা করে নিয়ে সবে গুছিয়ে বসেছি, দেখি কি, মাঝখানের দু'টো বেঞ্চি পার হয়ে ওদিক থেকে একজোড়া চোখ ভুরু কুঁচকে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

চোখ ফিরিয়ে নিলাম সঙ্গে সঙ্গে, কারণ যিনি তাকিয়ে ছিলেন তিনি পুরুষ নন, মহিলা। বয়সে আমার চেয়ে বেশ কিছু বড়।

আমার প্রায় মুখোমুখি বসেছিলেন তিনি। মাঝখানে শুধু দু'বেঞ্চি মাথা দুলতে শুরু করেছিল ট্রেনটা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে। তাদের মাথার দোলানিতে অবশ্য ভদ্রমহিলার মুখটা এক এক একবার ঢাকা পড়ছিল, এক একবার দেখা যাচ্ছিল।

দেখা গেলে কি হবে, আমি চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। কারণ যতবার আড়চোখে তাকাই ততবারই দেখি তিনি ঠায় এক-দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। দু-একবার সন্দেহ হল তিনি যেন ঠোঁট টিপে মুচকি মুচকি হাসছেন আমার অস্বস্তি দেখে।

ফর্সা গোলগাল মুখ, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, হাতে কি একটা বইও ছিল। মাঝে মাঝে তিনি সেটা পড়বার চেষ্টা করছিলেন, আর থেকে থেকে তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে।

সে যে কি অস্বস্তি, বলে বোঝাতে পারব না। আমি তাই ইচ্ছে করেই জানালায় মুখ গলিয়ে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলাম।

ট্রেন তখন বেশ জোরে চলতে শুরু করেছে।

অনেকক্ষণ জানালায় গলা বাড়িয়ে থাকার জন্যে ঘাড় টনটন করছিল, মাথা তুলতেই তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে মুচকি হেসে তিনি বলে উঠলেন, কি রে, চিনতে পারছিস না ?

বেশ জোরেই বললেন, যাতে দু'টো বেঞ্চি পার হয়ে কথাটা আমার কাছে এসে পৌঁছয়।

চমকে উঠলাম প্রশ্ন শুনে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম তাঁকে। কিন্তু চিনতে পারলাম না। আমাকে বোধ হয় সে মুহূর্তে খুব অসহায় দেখাল।

আমার অবস্থা দেখে হাসলেন তিনি। বললেন, এ লাইনে কোথায় যাচ্ছিস ? মামাবাড়ি ?

বললাম, হ্যাঁ।

তারপর নানা প্রশ্ন। বাবা ভাল আছেন ? মা কাশী থেকে ফিরেছেন ? মীনার বিয়ের কিছু ঠিক হল ? নিমু চাকরিবাকরি পেল ? আর একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছি আমি।

হঠাৎ একবার থেমে পড়ে বললাম, উত্তর দেব না আপনার কথার।

সশব্দে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, কেন ?

বললাম, এত সব জিগ্যেস করে গেলেন, অথচ আপনাকে চিনতেই পারলাম না।

উত্তর এল, তুই বল্ না আমি কে !

বললাম, সত্যি চিনতে পারছি না।

ভদ্রমহিলার মুখ থেকে হাসি সরে গেল। ক্রমে ক্রমে মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, আমি তোর সেজোমামীমা।

উত্তর দিতে তিনি যেন বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। কিন্তু উত্তর শুনেও আমি চট্ করে বুঝে উঠতে পারলাম না।

মনে মনে আমি তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করছি। সেজো-মামীমা? এ কেন সেজোমামীমা হবে!

এদিকে ট্রেন তখন এসে দাঁড়িয়েছে একটা ছোট্ট স্টেশনে; তাড়াহুড়া করে সেই স্টেশনেই নেবে গেলেন তিনি। ট্রেন আবার ছেড়ে দেবার মুহূর্তে ফিরে তাকিয়ে মুচকি হেসে বিদায় জানালেন।

আর স্টেশনের নামটা চোখে পড়তেই মনে পড়ে গেল। আরে, এ ত করনডিহির মামীমা, আমাদের বুলুমামীমা।

আশ্চর্য, বুলুমামীমাকে একেবারে চিনতেই পারিনি। অনু-শোচনায় মন ভরে গেল। ব্যথায় টনটন করে উঠল বুকটা।

আশ্চর্য। যার কথা আমরা কোনদিন ভাবিনি, যার কোন খবরই রাখিনি এতকাল, তিনি দেখেই চিনতে পারলেন, কথাবার্তায় মনে হল সব খবরই রাখেন আমাদের, সম্পর্কটা আমরাই মুছে ফেলেছি, তিনি কিন্তু মনে মনে পুষে রেখেছেন সব স্মৃতি।

আমি তোর সেজোমামীমা।

কথাটা বারবার গুণগুণ করল মনের মধ্যে। চেহারাটা তাঁর বদলে গেছে বলেই কি? না মন থেকে তাঁকে মুছে ফেলেছি বলেই চিনতে পারলাম না?

সেজোমামীমা বলতেই চোখের সামনে অন্য একটি মুখ ভেসে উঠেছিল। যে মুখ গত দশ বারো বছর ধরে দেখে আসছি। মামাদের সমস্ত সংসারটি যিনি বাসুকির মত ধারণ করে আছেন মাথার ওপর। খেতে ভালবাসি বলে সারা গাঁ খুঁজে যিনি মাগুর মাছ জোগাড় করে আনেন। ইঁচোড়ের তরকারি রাঁধেন চমৎকার। অর্থাৎ রাণীমামীমাকেই আমরা সেজোমামীমা বলে জানি। আর ট্রেনে দেখা ইনি হলেন বুলুমামীমা।

ব্যাপারটা হল এই যে সেজোমামার দু'টো বিয়ে।

রাণীমামীমা আর বুলুমামীমা।

দাদামশাই ছিলেন ও তল্লাটের বড় জমিদার। কত বড় তা ভাঙ্গা পুরানো কাছারিবাড়িটা দেখলেই বোঝা যায়। বিয়ের সময় ধুমধামও কম হয়নি! ব্যাণ্ড বাজানোর দল এসেছিল কোলকাতা থেকে, কারবাইডের আলোয় সাজানো হয়েছিল চতুর্দিক, আর নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ছ'হাজারেরও বেশি।

সে-সব ছবি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। স্পষ্ট মনে পড়ে সব।

দাদামশায় দামী শাল গায়ে দিয়ে রূপোর পাতে মোড়া ছড়ি হাতে হুকুম দিচ্ছেন সকলকে, আদর আপ্যায়ন ঠিক হচ্ছে কিনা তদারক করছেন। আর সকলেই তটস্থ, ছোটখাট কোন গাফিলতির জন্যে দাদামশাই না চটে যান। চটে গেলে কারও রক্ষে নেই, প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন।

সত্যি কথা বলতে কি, দাদামশাইকে মামারাও ভয় পেত। আমরা ত অনেক সময় কাছে যেতেই সাহস পেতাম না। কারণ এমনি সকলের সঙ্গে হেসেখেলে কথাবার্তা বলতেন বটে, কিন্তু তাঁর হুকুমকে ভয় পেত সকলে। একবার যা মুখ থেকে বের হবে তার নড়চড় হবে না।

বিয়ে যখন ঠিকঠাক বাবা নাকি বলেছিল, যার বিয়ে তাকে একবার মেয়ে দেখে আসতে বললে হত না ?

দাদামশাই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, মেয়ের বাপ তার মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছে আমার ছেলের সঙ্গে। পাত্র দেখে যদি বিয়ে দিত ত পাত্রের মতামতের কথা উঠত।

আর এই কথাই শেষ পর্যন্ত বহাল রইল। নিজে মেয়ে দেখতে যেতে পেলেন না সেজোমামা।

বিয়ের পর টোপর-পরা সেজোমামার পিছনে পিছনে গাঁটছড়া

বাঁধা রাণীমামীমা যখন এসে নামলেন গাড়ি থেকে, তখন সব আশঙ্কা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

এমন রূপ নতুন বৌয়ের ?

সবাই তারিফ করল দাদামশাইকে।

বললে, পছন্দ বটে, খুঁজে খুঁজে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকেই ছেলের বৌ করে এনেছেন।

তাবিফ শুনে খুশির হাসি হাসলেন দাদামশাই।

বললেন, দেখ বাপু, বুড়ো বয়সটার একটা দাম আছে। ছেলেছোকরারা ভুল কবতে পাবে, কিন্তু বুড়োরা ভুল করে না।

সবাই স্বীকাব করল সে-কথা।

রাণীমামীমা যে শুধু দেখতেই সুন্দব ছিলেন তাই নয়, গুণও ছিল অনেক। মাস কয়েক যেতে না যেতে সে-পবিচয়ও পাওয়া গেল। সব সময়ে মুখে হাসি লেগে আছে। সংসারেব যে-কাজই হোক্, সব প্রথমে এগিয়ে আসবেন বাণীমামীমা। শ্বশুর শাশুড়ির সেবা, ছোটদের যত্নআত্তি থেকে পুজোপার্বণেব ব্যবস্থা, সবদিকেই চোখ তাঁর। শত বিপদ আপদেও মুখে হাসি লেগেই আছে।

কিন্তু সে আর কতদিন। বছব না ঘুবতেই অঘটন ঘটে গেল একদিন।

দাদামশাই বসে বসে তেল মাখছিলেন।

রাণীমামীমা সামনের কুয়োয় জল তুলছিলেন দাদামশাইয়ের স্নানের জন্যে। বাড়িতে চাকরবাকব যথেষ্ট থাকলেও দাদামশাই নিজের হাতে তেল মাখতেন, আর রাণীমামীমা নিজের হাতে জল তুলে দিতেন তাঁর স্নানের জন্যে।

এদিকে তেল মাখতে মাখতে হঠাৎ দাদামশাইয়ের চোখ গেল রাণীমামীমার পায়ের দিকে।

তাঁর পায়ের গোড়ালির ওপর চোখ পড়তেই কপাল কুঁচকে উঠল দাদামশাইয়ের।

গম্ভীর গলায় ডাকলেন, সেজোবৌমা! এদিকে এস ত একবার।

ঘোমটাটা একটু টেনে রাণীমামীমা হাসি মুখে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

দাদামশাই একটা আঙ্গুল দেখালেন রাণীমামীমার গোড়ালির দিকে। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, কি এটা?

আমিও দেখিনি তার আগে। দেখে শিউরে উঠলাম। শ্বেতির দাগটুকু দেখে ঘৃণায় আতঙ্কে সরে এলাম।

রাণীমামীমা চুপ করে রইলেন। কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কিই বা উত্তর দেবেন এ প্রশ্নের।

দাদামশাই আবার প্রশ্ন করলেন, কতদিন হয়েছে?

রাণীমামীমা এবারও কোন উত্তর দিলেন না।

দাদামশাই জিগ্যেস করলেন, বিয়ের আগে থেকেই আছে?

রাণীমামীমা মাথা নীচু করে পায়ের নীচে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন, হ্যাঁ।

আর কোন কথা হল না। তোলা জল হুড় হুড় করে ঢেলে দিলেন দাদামশাই, নিজে জল তুলে স্নান সেরে বেরিয়ে গেলেন বৈঠকখানায়।

সারা বাড়ি তখন থমথম করছে। সকলের মুখে চোখে আতঙ্ক। দাদামশাইয়ের ভাবগতিক দেখে সকলেই বুঝতে পারল ঝড়ের পূর্বাভাস এটা।

একে একে কানাঘুষো, ফিসফাস বন্ধ হল। শুনলাম, দাদামশাই নাকি রাণীমামীমার বাবাকে চিঠি দিয়েছেন অপমান করে। চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁর মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

সপ্তাহখানেক পরেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন রাণীমামীমার বাবা। পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন, কত কি বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু দাদামশাই এতটুকু নরম হলেন না। সকলেই বুঝতে পারল, তাঁর মত বদলানো যায় না।

এদিকে রাণীমামীমার অত সুন্দর চেহারা, এক সপ্তাহেই কালি হয়ে গেছে। তিন মাসের রুগীর মত পাংশু মুখ, চোখের কোলে দুশ্চিন্তার দুঃখের ছায়া। শরীরে কোথাও যেন একফোঁটা রক্ত নেই। দেখলেই মনে হয় যেন কান্না থমকে আছে চোখের আড়ালে। কানা অবধি ভর্তি জলের গেলাসের মত, একটু নাড়া দিলেই যেন উপছে পড়বে।

বাবা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, মামারা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। এমন কি দিদিমাও রাগ করে আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন। কিন্তু দাদামশাইয়ের সেই এক কথা।—এ রোগ আমাদের বংশে কারও কখনও হয়নি, এ রোগে আমাদের বংশ নষ্ট হতে দেব না।

গাঁয়ের ডাক্তারকে ডেকে আনা হল, তিনি বোঝালেন, এটা এমন কিছু ভয় পাবার মত রোগ নয়। ছোঁয়াচে ত নয়ই।

কিন্তু কে শোনে কার কথা।

শেষ পর্যন্ত দিদিমা বললেন, তুমি কি পাগল হয়েছ, বৌমার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারনি? এ সময় কি যাও বললেই যাওয়া চলে?

সে কি? চমকে উঠলেন দাদামশাই। দিদিমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তাহলে আর কোন কথা চলে না, ও মেয়েকে আমার বাড়ির বৌ করে রাখতে পারি না। ও রোগ জন্মগত।

কান্নাকাটি অনুরোধ উপরোধ কিছুই টিকল না। রাণী-মামীমাকে চলে যেতে হল।

রাণীমামীমা চলে যাওয়ার পর থেকে পরিবর্তন শুরু হল সেজোমামার। সব সময়ে চুপচাপ বসে কি যেন ভাবেন, একা একা থাকেন, কথা বললে বিরক্ত হন।

দাদামশাইয়ের কাছে চাপা থাকলেও আর আর সকলেই জানত। আগে জানালে হয়ত বিয়েই হত না, এই আশঙ্কায় এটুকু চেপে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন রাণীমামীম' বাবা। বিয়ের পরই নাকি কাঁদতে কাঁদতে সে-কথা সেজোমামাকে বলেছিলেন রাণীমামীমা।

সেজোমামার দিক থেকে কোন ক্ষোভ ছিল না, কোন আক্ষেপ ছিল না তার জন্যে।

তাই সবচেয়ে বেশি আঘাত পেলেন সেজোমামা নিজে। আরো আঘাত পেলেন যখন দাদামশাই বলে বসলেন, ছেলের আবার বিয়ে দেব আমি।

বেঁকে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন সেজোমামা।

সেই প্রথম বোধ হয় দাদামশাইয়ের বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করার সাহস পেল।

বাধা পেয়ে আরও রেগে গেলেন তিনি। ঘটককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মেয়ে দেখতে।

ফিরে এলেন পাত্রী দেখে, বিয়ের দিন পাকাপাকি করে।

খবর পেয়ে রাণীমামীমার বাবা চিঠি লিখলেন, মেয়েকে বড় ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন, সেরে উঠবে আশা দিয়েছেন ডাক্তার।

দাদামশাই হাসলেন চিঠি পেয়ে। সেরে যাবে? ও বিষ দূর করা কি সহজ কথা? পায়ের গোড়ালিতে আছে এখন, ক্রমশ সর্ব-শরীরে হবে। শ্বেতি ভীষণ রোগ, ধবলও যা শ্বেতকুষ্ঠও তাই। আপত্তি ত শুধু রোগের জন্য নয়। মেয়ের বাপ তাঁর সঙ্গে এমন

'প্রবঞ্চনা করল কেন। আগে জানায়নি কেন? সেরে গেলেও ও ঠগ জোচ্চোরের মেয়েকে বাড়ির বৌ করে আনবেন না তিনি।

সেজোমামা বেঁকে দাঁড়ালেন, বিয়ে করব না আমি, বিয়ের শখ আমার মিটে গেছে।

বিয়ে করবে না? রেগে আগুন হয়ে উঠলেন দাদামশাই, হুমকি দিলেন, ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলে শাসালেন। শেষে কোন কিছুতেই যখন কাজ হল না—আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বসলেন, বিয়ের দিন ঠিক করে ভদ্রলোককে কথা দিয়ে এসেছি আমি, আমার সম্মান যদি না রইল ত বেঁচে থেকে কি লাভ। আমি আত্মঘাতী হব।

শেষ পর্যন্ত সাহস হারালেন সেজোমামা। বিয়ে করতে রাজি হলেন।

বিয়ে হয়ে গেল। রাণীমামীমার বদলে এলেন বুলুমামীমা।

সকলেই ভেবেছিল দু'দিন পরেই সংসারের চাকা আবার সচল হবে। আবার সুস্থভাবে জীবন শুরু হবে সেজোমামার।

ভুল বুঝেছিল সকলে।

দাদামশাইয়ের বিরুদ্ধে সেজোমামার যত আক্রোশ সব গিয়ে পড়ল বুলুমামীমার ওপর। যেন সংসারের সমস্ত অশান্তির জন্যে বুলুমামীমাই দায়ী।

বুলুমামীমার সঙ্গে ভাল করে কথাও বলতেন না সেজোমামা। পরিবারের অন্য সকলেও তাঁর সঙ্গে কেমন একটা দূরত্ব রেখে চলত। তাই জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল বুলুমামীমার। টিকতে পারলেন না।

ছাই চাপা আগুনের মত বিতৃষ্ণায় জ্বলছিলেন বুলুমামীমা। হঠাৎ একদিন কি একটা সামান্য ব্যাপার থেকে তুমুলকাণ্ড বাধিয়ে তুললেন। রাগারাগি করে বাপের বাড়ি চলে গেলেন। আর ফিরলেন না।

সেজোমামা ফিরিয়ে আনতে গিয়ে একাই ফিরে এলেন।

দাদামশাই চিঠি দিলেন, তার উত্তর এল না।

সবই লক্ষ্য করছিলেন দাদামশাই, মুখ বুজে সহ্য করছিলেন সব কিছু। বুঝেছিলেন, ইচ্ছে থাকলে মানুষকে সবই দেওয়া যায়, দেওয়া যায় না শান্তি। বুলুমামীমার অশান্তি, সেজোমামার অশান্তি, সংসারের অশান্তি দেখতে দেখতে কঠিন অসুখে পড়লেন তিনি। বেশ কিছুদিন রোগে ভুগে মারা গেলেন।

মৃত্যুর খবর পেয়েই ছুটে এলেন রাণীমামীমা। কোলে তখন তাঁর ছোট্ট একটি মেয়ে। যে মেয়ের জন্মের খবর পেয়েও সেজো-মামাকে দেখতে যেতে দেননি দাদামশাই।

পাছে দিদিমা পা সরিয়ে নেন এই ভয়ে স্পর্শ বাঁচিয়ে প্রণাম করলেন রাণীমামীমা। দিদিমা কিন্তু দূরে সরে থাকতে পারলেন না। দু'হাত বাড়িয়ে ফুটফুটে নাতনীটিকে কোলে তুলে নিলেন।

বললেন, সেজোবৌমা, ভগবান যা দিয়েছেন তাকে ঘৃণা করা চলে? তোমার পায়ে যা হয়েছে তা ত আমার ছেলের গায়েও হতে পারত। তখন কি তাকে ফেলে দিতাম?

সে-কথা শুনে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে রাণীমামীমার সে-কি কান্না। দিদিমাও কাঁদল, বাড়ির সকলেই কাঁদল।

চোখের জলে সব বিষ, সব অভিশাপ ধুয়ে মুছে গেল। শান্তি নামল সংসারে।

কিন্তু দিন কয়েক পরেই বুলুমামীমাও এসে হাজির হলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর খবর জেনেও কি করে আর দূরে থাকেন।

বুলুমামীমা প্রণাম করে উঠতেই ছোট্ট ফুটফুটে নাতনীটিকে তাঁর কোলে দিয়ে দিদিমা হেসে বললেন, এই নাও তোমার মেয়ে, এবার থেকে তোমার।

—মেয়ে? কার মেয়ে? বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠল বুলু-মামীমার!

এদিকে পরিচয় পেয়েই রাণীমামীমা ছুটে এলেন। বোনের মত স্নেহের আলিঙ্গনে বুলুমামীমাকে কাছে ডাকলেন।

কিন্তু বুলুমামীমার চোখে তখন আরও বিস্ময়। যেন ঠিক এমনটি আশা করেননি তিনি। বোধ হয় অন্য কিছু ভেবেছিলেন, অন্য কি কল্পনা।

যেমন এসেছিলেন হঠাৎ, তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন তিনি। কেন চলে গেলেন কেউ বুঝতে পারল না।

তারপর আর ফিরে আসেননি বুলুমামীমা। হয়ত দশ, হয়ত বারো বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু কোনদিন তাকে ফিরিয়ে আনার কথা কল্পনাও কবেননি সেজোমামা।

প্রথম প্রথম আলোচনা হত, দু'একবার নাম উঠত বুলু-মামীমার। কেউ শুধু তারই দোষ দেখত, কেউ বলত, তাব কোন অপরাধ নেই।

এমনি করেই কখন যে সকলের মন থেকে বুলুমামীমার নাম মুছে গেল, কখন যে আমরা তাকে একেবারে ভুলে গেলাম, তা বুঝতে পারিনি। তিনি বেঁচে আছেন কি নেই, থাকলে কোথায় আছেন, কেমন আছেন, এ-সব প্রশ্নও মনে জাগেনি কোনদিন।

দশ বারো বছব পবে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সেই বুলুমামীমার সঙ্গে। চেহারা একেবারে বদলে গেছে। দেখে চেনাই যায় না।

তারপর স্টেশনের নামটা দেখে মনে পড়ে গেল। কিন্তু তখন আর সময় নেই, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

বাড়ি পৌঁছে খবরটা না জানিয়ে থাকতে পারলাম না।

সকলের সামনেই বললাম, আজ একটা ব্যাপার হয়েছে। বুলু-মামীমা—করনডিহির মামীমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ট্রেনে!

সকলেই চম্‌কে উঠল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত ঘটনার আনু-পূর্বিক বর্ণনা দিলাম। বললাম, বুলুমামীমা কিন্তু আমাদের সব খবরই রাখেন। আমরাই শুধু তার কোন খবর রাখি না।

সকলেই গম্ভীর হয়ে গেল। কেউ কোন কথা বলল না। শুধু সেজোমামার মুখখানা হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল, কেমন যেন চাপা কান্নায় থমথম করছে। মাথা নীচু করে বসে রইলেন।

তারপর এক সময় সকলে উঠে যেতে সেজোমামা ফিসফিস করে বললেন, হ্যাঁরে, আমার কথা কিছু জিগ্যেস করল?

বললাম, কই না ত।

—কিছু জিগ্যেস করল না?

বললাম, না।

চুপ করে রইলেন, কোন কথা বললেন না আর।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ওব আর কি দোষ বল, সব দোষ ত আমাদেরই।

বললাম, যাও না সেজোমামা, গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এস তুমি। এভাবে একটা জীবন নষ্ট হবে চোখের সামনে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেজোমামা বললেন, তাই ভাবছি। হ্যাঁ যাব, ফিবিয়ে আনতে যাব আমি। কাল সকালেব ট্রেনেই।

বলে স্যুটকেস গুছাতে শুরু করলেন সেজোমামা। রাণী-মামীমা নিজেই স্যুটকেস গুছিয়ে দিলেন! বললেন, সত্যি ত, দোষ আমাদেরই, যাও ফিরিয়ে নিয়ে এস ওকে।

পরের দিন ভোর বেলাতেই ট্রেন।

ভোর বেলায় ঘুম ভাঙতে দেখি সেজোমামা তখনও ঘুমোচ্ছেন। ডেকে বললাম, করনডিহি যাবে না?

সেজোমামা ঘুম ঘুম চোখেই বললেন, বড় ঘুম পাচ্ছে রে, এখন থাক, দশটার ট্রেনে যাব।

দশটার সময় খোঁজ নিয়ে জানলাম, একটা কাজ সেরে আসতে গেছেন সেজোমামা।

ফিরে এসে বললেন, বড় দেরি হয়ে গেলরে, বিকেলের ট্রেনেই যাব।

বিকেল বেলায় বললেন, শবীরটা ভাল নেই, তাছাড়া পরের সপ্তাহে ত ওদিক দিয়ে যেতেই হবে, তখনই বরং···

পরের সপ্তাহে ফিরে আসতেই বললাম, করনডিহি গিয়েছিলে ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেজোমামা বললেন, যাওয়া আর হল কই। যা কাজের চাপ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, কোন্ মুখেই বা যাব বল্।

জিগ্যেস করলাম, কেন ?

উত্তর এল, বাবাকে যদি ঠগজোচ্চোর বলে অপমান করে। মেয়ে দেখতে গিয়ে বাবা যে তোর রাণীমামীমার কথা একেবারে চেপে গিয়েছিলেন।

চমকে উঠলাম সেজোমামাব কথা শুনে। বাণীমামীমার গোড়ালির সেই সাদা দাগকুটু দেখে একদিন দাদামশাই যেমন চমকে উঠেছিলেন।

বহুদিন আগে দাদামশাইয়ের মুখে শোনা 'প্রবঞ্চনা' কথাটা হঠাৎ যেন কানে বাজল, যেন দাদামশাইকেই বিদ্রূপ করে উঠল কথাটা।

মেকি

এক্সপ্যাণ্ডেড মেটালের ছোট ছোট জানালাগুলো না থাকলে প্রিজন্ ভ্যানটার সঙ্গে মালবাহী কোন অন্ধকূপ গাড়ীর পার্থক্য থাকত কিনা সন্দেহ। পার্থক্য অবশ্য আছেই। সফিউদ্দিন আর আরো আঠারোজন রিম্যাণ্ডের কয়েদীর সঙ্গে তেলের পিপে বা প্যাকিং বাক্সের কোন তফাত ওদের চোখে না থাকলেও তফাত আছে অন্যদিকে। ক্যাশ আপিসের গাড়ী, নয়ত লাটের লিমোজিনে যেমন বন্দুকধারী সিপাই বসে থাকে ড্রাইভারের পাশে, প্রিজন্ ভ্যানের সাম্‌নের আসনেও তেমনি জন দুই সঙ্গীনধারী গোঁফে চাড়া দিয়ে পথচারীদের বুঝিয়ে দেয় এটা মেটাল বাক্সের গাড়ী নয়, পর্দানশীন ইস্কুলের বোরখা-উঁকি মেয়েরাও নেই জাল-জানালার ওপাশে।

সফিউদ্দিন আর আরো আঠারোজন রিম্যাণ্ডের কয়েদী কিন্তু হাঁপিয়ে ওঠে বাতাসবিহীন অন্ধকারের গুমোটে। জাল-জানালায় নাক চেপে পর্দানশীন ইস্কুলের মেয়েদের মতই পথ দেখে, পথের লোক দেখে। তেষ্টায় ছাতি ফাটছে, ক্ষিদেয় পাক দিচ্ছে পেট, তবু বলবার উপায় নেই। শুনবে না কেউ, শুনলে ধমক, নয়ত ব্যাটনের ঘা। তেমন তেমন হলে বেয়নেটের খোঁচা। তার চেয়ে চোখের তৃষ্ণা মেটানো অনেক সুখের, অনেক আনন্দের।

সত্যি, কতদিন যেন আলো আর হাওয়ার ছোঁয়া পায়নি ওরা। পৃথিবীর এত এত রাস্তাঘাট, লোকজনের মুখ—এ সব কিছুই দেখতে পায়নি। থানার হাজতে নোংরা পচা দুর্গন্ধের মধ্যে মাত্র

ক'টা দিন, তাও যেন কত বছর মনে হয়। চলন্ত গাড়ীর ভেতর রাস্তার আলো-বাতাস উঁকি দিতেই নতুন করে নিঃশ্বাস নিল যেন সফিউদ্দিন। সফিউদ্দিন আর আরো আঠারোজন রিম্যাণ্ডের কয়েদী নতুন করে বেঁচে উঠল যেন।

আশ্চর্য! সফিউদ্দিন মনে মনে ভাবে, হাসি হাসি মুখ পথচারীদের দিকে তাকিয়ে ঈর্ষায় জ্বলে যায় ওর বুক, অথচ দু'দিন আগে ও নিজে হেসে হেসে ঘুরে বেড়িয়েছে, সাকসেনাব মোড়ের দোকান থেকে ধারে পান কিনেছে, বিড়ি ধরিয়েছে দেওয়ালের দড়িতে। আর আজ? জেলের রাস্তাতেই হয়ত বা। কে বলতে পারে। মামলা তদ্বিরের লোক নেই যার, টাকা নেই উকিলের পেছনে ঢালবার, তার বিচার ত হয়েই আছে।

অথচ সফিউদ্দিন জানে, এক সফিউদ্দিনই জানে, ও নির্দোষ। পাপ ও অনেক করেছে, অনেকবার করেছে। মাসের প্রথম দিনে বুড়ো কেরানীর পকেট মেরে সারা মাস কাঁদিয়েছে কতবার, অন্ধকার গলিতে প্যারিস্ পিক্চার বিক্রির লোভ দেখিয়ে কত বাচ্চা ছেলের সোনার চশমা, গলার বোতাম, হাতের হাতঘড়ি ছিনিয়ে নিয়েছে। লরেটোয় পড়া কচি মেমসাহেবেব নাম করে আড্ডায় নিয়ে গেছে কত উড়ন্তি পায়বার ছানাকে, কেড়ে নিয়েছে তার নোটের বাণ্ডিল। কৈ, তখন ত ধরা পড়েনি ও। তখন ত পুলিশ ওর হদিস পায়নি।

একেই বলে নসীব। বিসমিল্লা উতরে গেল, গলদ ধরল আল্লায়। সত্যি, মনে মনে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ভালভাবে জীবন শুরু করল যখন সফিউদ্দিন, তখনই কিনা পুলিশের হাতে কয়েদী। ঘৃণায় অনুতাপে হাতের ছুরিটা যখন ছুঁড়ে ফেলে দিল তখনই এসে জুটল হাতকড়া। নসীব! নসীব একেই বলে! ভগবান যখন ভাল হতে বলবে, দুনিয়াদারি

দেবে বাধা। ছুনিয়া যদি ভাল হবার পথ বাতলে দেয় ত ভাগ্য বাদ সাধবে।

কি হবে অত ভেবেচিন্তে, কিইবা করতে পারে সফি। তার চেয়ে চুপচাপ নিজকে ছেড়ে দেবে ছ'জনেরই হাতে, যে পারে ওকে পথ দেখাক। সেই ভাঙা চার্চের বেঁটে পাদ্রীটা কি যেন বলেছিল একবার। কি যেন নামটা—তার কাছে নিজেকে বিক্রি করতে নিষেধ করেছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শয়তানের কাছে নিজেকে বিক্রি করো না। মনে মনে হাসে সফিউদ্দিন। আরে পৃথিবীর সব ক'টা লোকই শয়তানের কাছে বিক্রি হবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে, শয়তান যে ছাই কিনতে চায় না। তা নইলে এমন হাল ওর? বেশ ত ছিল। পকেট মেরে নয়ত গুণ্ডামী করে আজ যদি ওর জেল হত, ছুঃখ থাকত না এতটুকু। অথচ কোথাও কিছু নেই, দিব্বি মেহনত করে ভালভাবে বাঁচবার চেষ্টা করছে, সেই সময় কিনা থানাপুলিশের হুজ্জত।

কোর্টের ফটকে গাড়ী ঢুকতেই সফিউদ্দিন বললে, ঠিক্ আছে, শালা আবার শুরু করব।

পাশের কয়েদীটা হাতকড়া-বাঁধা হাত ছ'টো বেঁকিয়ে পিঠ চুলকোবার বৃথা চেষ্টা করে বললে, পিঠটা চুলকে দেত সফি।

ওর পিঠের ওপর হাতকড়াটা ঘষতে ঘষতে সফি বললে, শালা আবার শুরু করব, বুঝলি।

পাশের কয়েদীটা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই প্রিজ্‌ন ভ্যানের দরজা খুলে গেছে, সঙ্গীন উঁচিয়ে সিপাই ছ'টো এসে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে।

সফিউদ্দিন আর আরো আঠারোজন কোমরে-দড়ি হাতে-হাতকড়া রিম্যাণ্ডের কয়েদী আদালতের ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলল

লক্-আপের পাতালপুরীর দিকে। একটা সিপাই আগে আগে, একজন পেছনে খোঁচা দেবার জন্যে।

শেয়ালদার মাছের বাজারেও এত ভিড় দেখেনি সফি। কসাইখানাব কার্নিশেও এত কাকের ভিড় থাকে না, যত না কালো-কুর্তার ভিড় এখানে। সাদা প্যাণ্ট আর কালো কালো গলাবন্ধ কোট-পরা উকিলের ছড়াছড়ি। সবাই ব্যস্ত, সবাই কাজের লোক। সময় নেই যেন এতটুকু। সব ব্যাটা রক্তচোষা বাদুড়, মনে মনে ভাবলে সফি। পাতলুন পরেছে বাবুরা। এদিকে কাদার ছাপ, পানের ছোপ লেগে বাহার যা খুলেছে বলবার নয়। বছরে দু'বার ধোপার বাড়ী যায় কিনা সন্দেহ, কোটটা যে যায় না সে-ত জানাই। ঐ পচা পুরোন কুর্তা একবার ধোপার কাছে গেলে ফিরবে নাকি আর! তীর্থের কাকের মত ছোটাছুটিই সার, বিকেলে বাড়ী ফেরবার সময় পকেট ভরে ভুমুর কুড়িয়ে নিয়ে যায়, তাই হাঁড়ি চড়ে। তবু টেনে টেনে ইংরেজী বলে কেমন, যেন সিম্পসন সাহেবের ছোট ছেলে। যেখানে বারো আনার স্ট্যাম্প লাগবে, চেয়ে বসবে বারো টাকা। তারপর একে ঘুষ দিতে হবে ওকে ঘুষ দিতে হবে, ডেমি কেনো, টাইপ করাও—কত কি। নিজের ফি'টাও হাঁকবে কম নয়। আর সারাটা ক্ষণ স্তোক দেবে, খালাস পাবি খালাস পাবি বলে, তারপর এক নিঃশ্বেসে বলবে, যা ব্যাটা তোর পাঁচ বছর জেল হল।

উকিলদের কথা কম শোনেনি ও ছোটবেলা থেকে। একটা কথা ভাল করে শুনবে না, লিখে রাখবে না কাগজে-কলমে, আর হাকিমের এজলাসে গিয়ে উল্টো-পাল্টা বকে আসবে হাত-প নেড়ে।

না, উকিল দেবে না সফি, তার চেয়ে জেল খেটে আসবে সেওভি আচ্ছা।

ও যে হাজতে আছে, সাকিনাও হয় ত সে খবর পেয়েছে। কে জানে কি ভাবছে মেয়েটা। ভাবছে হয় ত, সফি সত্যিই এই সব নেংরা ব্যাপারে জড়িয়ে আছে। অনেক করে সাকিনাকে বুঝিয়েছিল ও, চুরি-পকেটমার রাহাজানি সব ছেড়ে দিয়ে শরীফ হবার চেষ্টা করছে। সাকিনা এখন কি আর বিশ্বাস করবে? ওর সঙ্গে নতুন করে ডেরা বাঁধতে রাজি হবে আর?

ঘরে বুড়ি মা আজ মরে কি কাল মরে, মনে রঙিন স্বপ্ন সাকিনাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার, তার ওপর ভদ্রঘরের মেয়েকে জোর-জবরদস্তী নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটাও মনে মনে ঘেন্না করে সফিউদ্দিন। তাই না ওর এত লজ্জা, এত ভয়। লোকে কি বলবে, লোকে কি ভাববে তা নয়, সাকিনা কি বলবে, সাকিনা কি ভাববে! তাই। তাই ওর মত অমন চওড়া কাঁধের নওজোয়ান মানুষ, যে কিনা একদিন খুন-জখমে ভয় পেত না, যার একটা চড় খেয়ে টমি সার্জেণ্ট নাল্লার জলে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, সেও পুলিশ সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল!

—আমাকে ছেড়ে দিন হুজুর, আমি এসবের মধ্যে নেই হুজুর।

পুলিশ সাহেব হেসে বলেছিল, তা হলে ছাড়াই পাবি।

—কি করে ছাড়া পাব হুজুর? আশায় আনন্দে চক্‌চক্ করে উঠেছিল সফির চোখ। আর পুলিশ সাহেব মুচকি হেসে বলেছিল, হাকিমের এজলাসে আইন আছে রে ব্যাটা। হাকিম ধরে নেবে তোর কসুর নেই, আমরা প্রমাণ করব তুইও আছিস এর মধ্যে।

—তা হলে হুজুর? আশা-ভরসা হারানোর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সফি।

উত্তর আসে, তোর দোষ না থাকলে আমরাও ত প্রমাণ করতে পারব না। তা হলেই খালাস পাবি।

ফুঃ। মনে মনে ঘৃণার হাসি হেসেছিল সফি। প্রমাণ, প্রমাণ ও অনেক দেখেছে, পুলিশকেও দেখেছে। আর হাকিম? দেখেনি বটে, কিন্তু শুনেছে অনেক। মামলা হয়ে যাওয়ার পর নাকি পুলিশের উকিল কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে আসে।

বিচার। বিচার হবে ওর। কিসের বিচার? অপরাধ করেছে কি করেনি, তার বিচার? না, টাকার। শুধু টাকার বিচার, তা সে যে পথেই যাক্, যে পথেই ঢাল। হয় টাকায় পুলিশের মুখ বন্ধ কর, তার ডাইরীর পাতা ছিঁড়ে ফেলবে পুলিশ, আর তাও যদি না পারে ত এমন ফাঁক রাখবে যে সুড়ুৎ করে পার পেয়ে যাবে তুমি। আর তা যদি না চাও ত টাকা ঢাল অন্যদিকে। নিয়ে এস বড় আদালতের এমন উকিল-ব্যারিস্টার যাকে দেখে ছোট হাকিম ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপবে। কত বড় বড় সাক্ষীসাবুদ তৈরী হয়ে যাবে টাকার জোরে। উকিলের বুদ্ধিতেই যদি হাকিমেব রায় এদিক ওদিক হয়, তা হলে আবার বিচারটা কোথায়? আইনে আসামীকে নির্দোষ ধবে নেওয়ার সার্থকতা কোথায়?

সফি নিজে ত জানে এ ব্যাপারটায় ওর হাত ছিল না মোটেই। যা সত্যি, যা জানে ও নিজেই বলবে হাকিমকে। পুলিশের শানানো বানানো কথায় চোরামি আছে কিনা, মিথ্যে আছে কিনা হাকিম খুঁজে বের করবে, করে বে-কসুব খালাস দেবে ওকে। হ্যাঁ, তবেই বুঝবে বিচার আছে।

পুলিশ সাহেব বলেছিল, হাকিম জিগ্যেস করবে 'গিল্টি' না 'নট গিল্টি।' বলবি, গিল্টি হুজুর, অন্যায় হয়ে গেছে আর করব না। তা হলে ফাইন করে ছেড়ে দেবে। তা নইলে—

শুনে হেসেছে সফি। গিল্টি! গিল্টি ত পৃথিবীর সবাই, আসল সোনা কি আর আছে নাকি পৃথিবীতে। কিন্তু অন্যায়

হয়েছে, কসুর হয়েছে একথা বলবে কেন ও? ও ত সত্যিই কোন দোষ করেনি।

মুখে বললে, হুজুর, আমি ত কসুর করিনি কিছু। মাপ চাইব কেন হুজুর?

উত্তর এসেছিল ভারি বুটের ঠোক্করে।

তেমনি আরেক ঠোক্কর খেয়ে মন ফিরে এল সফির। আদালতের হাজতে। হাজতের ফটক অবধি যখন আসতে পেরেছে ও, তখন কি আর বুটের ঠোক্কর না দিলে ভেতরে ঢুকত না?

যাক্।

সফিউদ্দিন আর আরো আঠারোজন রিম্যাণ্ডের কয়েদী হাজতের নোংরা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল। তারপর তাকাল চারপাশে।

মাটির নীচেও যে ঘর থাকে তা জানত সফি; আগেও দেখেছে। গুণ্ডা গোঁসাইয়ের আড্ডায় যখন নাম ছিল ওর, তখন দশেরায়, বখ্‌রিদে এমনি এক চোরাকুঠরির পাতালপুরীতে সারা রাত চলত ওদের জুয়ার গুলতানি। তাস আর মদ। আর সস্তা মেয়ের চোখ-কাঁপানো বুক-ঝাঁকানো গান। আবার লুঠের মাল, সাফাই করা সোনাদানা এনে রাখত সে-ঘরে, ভাগবাঁটারার আওয়াজ পেলেই এসে জুটত সবাই। কিন্তু সে-ঘর মাটির নীচে সাপের গর্তর মতই ছোটখাট, কাঁধে-কনুইয়ে ঘেঁষাঘেঁষি হত সাতটা লোক ঢুকলে, তিনটে মেয়ে আনলে ঠাওর হত না কে কার কোলে।

এ-ঘর কিন্তু সে-ঘর নয়। কম করে একশো কয়েদী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসতে পারে এখানে। আর উঁচুই বা কম কিং, জেলের দেওয়ালকেও হার মানায়। সুড়ঙ্গের মত সিঁড়িটা এসে নেমেছে

এ ঘরে, আর ঐ সিঁড়ির মুখে লোহার ফটক আবছা আবছা আলো ছুঁড়ছে। কিন্তু এত আলো তবে আসছে কোত্থেকে? ভাল করে তাকিয়ে দেখলে সফি। হ্যাঁ, একদম মাথার ওপর, পঞ্চাশ হাত ওপরে এ ঘরেব ছাদ, আর সেই ছাদের ঠিক মাঝখানটায় লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। তারও বিশ হাত ওপরে আসলি ছাদ। আদালতের তিনতলার জানালায় ঠিকরে যেটুকু আলো ঢুকছে তারই খানিকটা উঁকি মারছে ঐ জালের ছাদ থেকে। হ্যাঁ জালের চারপাশটা যেন রেলিং দিয়ে ঘেবা, তাই মনে হল সফির, রেলিংএ ভর দিয়ে দু'চারটে লোক ওদেব দিকেই তাকিয়ে রয়েছে, সফি দেখতে পেল।

কেমন যেন গা সিরসির করে উঠল, নিজেকে ছোট মনে হল ঐ লোকগুলোব কৌতূহলী চোখের সাম্‌নে। অন্যদিকে চোখ ফেরাল সফি। আর দেখলে, আবেকটা সুড়ঙ্গ এদিক দিয়ে উঠে গেছে ওপবে।

পাশের লোকটাও সেদিকে তাকিয়েছিল, নিজেব মনেই যেন বললে, এইদিক দিয়ে হাকিমেব সাম্‌নে যেতে হয।

—তাই নাকি?—অন্য কে প্রশ্ন কবলে অবাক বিস্ময়ে।

—হুঁ! মাথা নাড়লে দাগী সবজান্তা।—হাকিমেব ঘবেও আবার এমনি জালের খাঁচা। শালাবা আমাদেব শেব ভাবে, না শয়তান ভাবে?

—পাকিটমাবকে জামিন দেবে না; আব শবীফ কেউ খুনী আসামী হলেও পি. আর. দিলিয়ে দেয়। কে যেন বললে।

সফি শুনল, শুনে হাসলে।—জামিন খাড়া হবাব মত কেউ আছে নাকি আমাদের?

—আছে বে বেটা, আছে।

—কে?

বুড়ো মিঞা সাহেব দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে আকাশের দিকে হাত দেখালে।

সবাই হাসল ওর কথায়, তারপর ভারি জুতোর মচ্‌মচানি শুনে সকলে একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

ভারি জুতোর কনেস্টবল গড়গড় করে নাম ডেকে গেল একরাশ, তারপর হাঁক ছাড়ল চাঁছা গলায়, চল সব।

অর্থাৎ ঐ সুড়ঙ্গ ধরে হাকিমের ঘরে চল সব।

সকলের সঙ্গে সফিও সিঁড়ি বেয়ে এসে হাজির হল হাকিমের ঘরে। আঃ, এত আলো এত বাতাস যেন এই প্রথম দেখতে পেল ও, স্পর্শ পেল। ছোট্ট লোহার খাঁচায় ওরা এতগুলি লোক ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে, তবু বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারছে।

হগ সাহেবের বাজারে কাঠের খাঁচায় মোরগ-মুরগির ঠাসা-ঠাসি দেখেছে সফি কতবার। আজ নিজেদের ঠিক সেই মোরগের মত হাল। লোহার জালে মুখ চেপে ভাসা ভাসা চোখ মেলে তাকালে ও হাকিমের মুখের দিকে। হাকিমের মেজাজ বোঝবার চেষ্টা করলে। হাকিম হাসলে ওরা স্রেফ খালাস পাবে।

আচ্ছা, এজলাসের সারবন্দী বেঞ্চিতে বসা ঐ উকিলগুলো কি ওদের খুনী আসামী ভাবছে? শুধু কালো-কুর্তা উকিলই নয়, ভদ্রলোকও কয়েকজন রয়েছে পিছনের সারিতে। জালে মুখ চেপে সেদিকে তাকাতে গিয়ে সফির চোখ পড়ল এক কোণে। আরে!, সাদাসিধে একখানা ফিরোজা রঙের শাড়ী পরা অমন মিঠে মুখ এই পিঁজরাপোলে?

সিঁথিতে সিঁদুরের টান, চোখে ক্লান্তি—তবু বড় ভাল লাগল সফির। কিন্তু ওরও কি এমনি হাল নাকি? কে জানে।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলে সফি। গালে কপালে ঘাম

ঝরছে মেয়েটির, শাঁখা আর সরু চুড়ির ফাঁকে ফর্সা হাত দু'খানা যেন বড় রোগা রোগা, মনের চিন্তা দেহের অসুস্থতা যেন একজোট হয়ে ওর চোখের পাতা ভারি করে দিয়েছে।

সফির নিজের মন থেকে সব ভাবনা-চিন্তা জেলের ভয় উবে গেল এক নিমেষে। শুধু বুকের ভেতর অনুভব করলে এক অবোধ্য ব্যথা। অচেনা একটি মেয়ের রোগপাণ্ডুর মুখের ছায়া যেন সবসময় ঘরখানাকে মেঘ-থম্‌থম্‌ বিষণ্ণতায় ডুবিয়ে দিয়েছে।

একটা কি শব্দ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে ফিরে তাকাল মেয়েটি ওদের জালঘরের দিকে। তন্ন তন্ন করে লোকগুলোর মুখের দিকে তাকাচ্ছে মেয়েটি; সফির মুখের আর চোখের ওপর দিয়েও যেন সে চোখের দৃষ্টি ভেসে গেল মূহূর্তের জন্য। সব দুঃখকষ্ট অভিমান মুছে নিয়ে গেল ওর মন থেকে।

আচ্ছা, কি ভাবছে মেয়েটি। ওখান থেকে কেমন দেখাচ্ছে ওদের? চিড়িয়াখানায় লোহার জাল দিয়ে ঘেরা ঘবের ভেতর জানোয়ারের পাল ভাবছে নাকি মেয়েটি?

ও, এইবার বোঝা গেছে। ওপাশের ঐ লম্বা স্যুটপরা লোকটাই ওর স্বামী। ও লোকটাও আসামী, বেশ বুঝতে পারছে সফি। তবু, আশ্চর্য, বসতে বললে হাকিম। মানীগুণী লোক হয়ত। কিন্তু আসামী লোকটাত আসামীই। ওর উকিলের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওপরের আদালত থেকে এসেছে। জবর কেস তা হলে নিশ্চয়ই।

কিসের মামলা? কে জানে, জেনেই বা কি হবে সফির। হ্যাঁ, মামলা ওদের আগেই হয়ে গেছে, আজ বুঝিবা রায় বেরুবে। মেয়েটির ঠোঁট জোড়া কাঁপছে নাকি! হয়ত। ভয়ে আশঙ্কায় চোখে কেমন এক উদাস হাওয়া।

ইংরেজীতে কি সব বলাবলি হল, বুঝল না সফি। শুধু

মনের ভেতর অনুভব করলে কিসের এক ব্যথা। আহা, লোকটা ছাড়া পাক্, লোকটা বেঁচে যাক্, ভাবলে ও। শুধু ঐ মেয়েটির ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সফি ভাবলে।

অনেকক্ষণ ধরে কি যেন পড়ে চলেছে হাকিম। আর মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে হাকিমের মুখের দিকে, প্রত্যেকটি কথা শুনছে মন দিয়ে। আশঙ্কায় ভয়ে ক্রমশ যেন রক্ত জমে উঠেছে মেয়েটির মুখে, কপাল বেয়ে ঝরে পড়েছে মুক্তোর মত বিন্দু বিন্দু ঘাম।

হঠাৎ সমস্ত মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেয়েটির। পৃথিবীর সমস্ত হাসি যেন একসঙ্গে এসে জড়ো হয়েছে ওর মুখে, আনন্দে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। লোকটির মুখের দিকে তাকালে, চোখাচোখি হল, আর তার মুখেও একটা ফিকে হাসি দুলে গেল।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে মেয়েটি, আর হাসছে, প্রাণ খুলে হাসছে। নতুন-জাগা ঝর্ণার মত, জ্যোৎস্না রাতের সমুদ্রের ফেনার মত হাল্কা আর উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মেয়েটির সারা মুখে, চোখে চোখে।

খালাস। খালাস পেয়েছে লোকটা। যাক্। নিজের কথা ভুলে গেল সফি, পাথর-চাপা বুক ওর হাল্‌কা হয়ে গেল। কিন্তু এবার, এবার ত মেয়েটি একবার তাকাতে পারে ওর দিকে। ঐ হাসিভরা চোখ কি একবার সফির মুখের ওপর ফেলতে পারে না। ওর উৎকণ্ঠায় সফিও নিঃশ্বাস চেপেছিল এতক্ষণ। ওর আনন্দে সফির চোখেও খুশি নেমেছে।

—খালাস হো গিয়া। কে যেন বললে।

—ওদের জেল আর খালাস! কে যেন মন্তব্য করলে।

বুড়ো মিঞাসাহেব দাড়িতে হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে দিলে ব্যাপারটা। অর্থাৎ জেল হলেও নাকি আরামে থাকত ও। সাহেবী ওয়ার্ডে থাকত, মিলত নবাবী খানাপিনা। আর কাজ? ঘানি ঘোরাতে হত নাকি ওকে? বসে বসে হিসেব লিখত দিনে দু'চার ঘণ্টা, আর নয়ত স্রেফ হাসপাতালে গিয়ে পড়ে থাকত। শালা 'এ কিলাস আসামীরা' তোফা থাকে। জেলখানার ডোরাকাটা শার্ট-পাতলুনও পরতে হত না।

ওরা সবাই বিস্ময়ে শুনল কথাগুলো। কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। কিন্তু বিস্মিত হল সবাই। সত্যি কি তা হয় নাকি? তবে আর বিচারটা কোথায়? শুধু আদালতেই নয়, জেলখানাতেও সেই টাকার দাম? যার দৌলত আছে তার কয়েদ কয়েদ নয়? কিন্তু মেয়েটি একবারও এদিকে তাকাচ্ছে না কেন? যার জন্যে নিজের ভয় ভাবনা ভুলে সহানুভূতিতে ভিজে এসেছিল সফির চোখ, কৃতজ্ঞতায় সে একবারও কি তাকাতে পারে না সফির দিকে?

হঠাৎ নিজের নাম শুনে চমকে ফিরে তাকাল সফি।

—ডু ইউ প্লিড গিল্টি? অর নট গিল্টি? গড়গড় করে বলে গেল লোকটা।

হিন্দিতে অনুবাদ করে দিল আরেকজন।

লোকটার, তারপর হাকিমের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে সফি, তারপর হাসতে হাসতেই বলল, গিল্টি।

গিল্টিই ত। সারা দুনিয়া গিল্টিতে ছেয়ে গেছে, আসল সোনা কি আর আছে হুজুর। সব গিল্টি, বেবাক্ গিল্টি, সব।

সফি নিজে অন্তত জানে, যে অপরাধে ওকে নিয়ে এসেছে সে অপরাধ ও করেনি। তা বলে সাচ্চা সোনাও ত ও নয়, কেউই ত নয়। আর, আর সাচ্চা সোনার দাম ত দু'টো চাঁদির চাকতির কাছে বিকিয়ে গেছে।

সফি আবার একবার আরো জোরে বলে উঠল, গিল্টি, গিল্টি হুজুর।

হুজুরও গিল্টি, এ কথা আর বলল না।

হিসেবী

মহীতোষবাবুকে এ-ভাবে দেখব কোনদিন কল্পনাও করিনি।

পার্কটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে অন্যমনস্কভাবেই তাকিয়েছিলাম প্রথমটা। ফুটপাতের উপর খড়ি দিয়ে চৌকো চৌকো কী সব ঘর কেটে একরাশ পুঁথিপত্র নিয়ে বসে ছিল লোকটা। গায়ে একটা ময়লা নামাবলী।

প্রথমটা চিনতে পারিনি। পার হয়ে খনিকটা যখন চলে এসেছি, তখন হঠাৎ মনে হল, মহীতোষবাবু না? ফিরে তাকালাম। চোখাচোখি হল আবার। এবং সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষবাবু অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

বোধহয় লজ্জায়।

লজ্জা আমারও। ফুটপাথের গণৎকাব হয়ে বসে আছেন মহীতোষবাবু, স্টিফেন্স কোম্পানির চার শ টাকা মাইনেব বড়বাবু মহীতোষ সান্যাল।

আমি তখন অনেক ছোট। সেই তখন থেকেই শুনে আসছি, মহীতোষবাবুর মত কৃপণ আর একটি নেই। বুড়োরা অবশ্য বলতেন, কৃপণ নয়, হিসেবী।

কৃপণ কিনা জানি না, তবে খুব হিসেবী লোক ছিলেন মহীতোষবাবু। তিরিশ টাকা মাইনেতে ঢুকেই এক হাজার টাকা ইন্সিওর করে ফেলেছিলেন।

সে যুদ্ধের অনেক আগেকার কথা। তিরিশ টাকা মাইনেতে তখন পাঁচটা লোকের সংসার চলত। আর পাঁচটা লোকই তখন এসে গিয়েছে তাঁর সংসারে।

বাপ ছিলেন ঐ স্টিফেন্স কোম্পানিরই বড়বাবু। মাইনে মোটামুটি ভালই পেতেন। ছেলে কলেজে পড়ছে, বংশ ভাল, মেয়ের বাপরা ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

ফলে, কলেজে পড়তে পড়তেই বিয়ে করে ফেললেন মহীতোষবাবু। করে ফেললেন বলব না, হয়ে গেল।

তারপর বছর না ঘুরতে একটি মেয়ে। মেয়ে হলেও মুখ ভার করার কারণ ছিল না তেমন। বিয়ের ভাবনা, সে পনর বছর বাদে ভাবা যাবে। হ্যাঁ, পনরতেই অরক্ষণীয়া হত তখন। আর ভাত-কাপড়ের ভাবনা ত মহীতোষবাবুর নয়, মহীতোষবাবুর বাবার।

মহীতোষবাবুর বাবা যা মাইনে পেতেন, তাতে ছেলে-ছেলের বৌ কেন, নাত্‌নী নাতজামাইকেও বসে খাওয়াতে পারতেন। টাকায় তখন পনর সের চাল। এক জোড়া কাপড় ছ'টাকা দশ আনা।

মহীতোষবাবুও প্রথম দিকটায় তাই অতশত চিন্তা করেননি। যখন চিন্তা করতে শুরু করলেন, তখন আর নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। তিন তিনটি ছেলেমেয়ে তখন।

মহীতোষবাবুর বাবা অবসর নিলেন কাজ থেকে, আর এতদিনের বিশ্বস্ত চাকরির পুরস্কার চেয়ে নিলেন, ছেলের চাকরি।

তিরিশ টাকা মাইনের কেরানীর চাকরি। তা হোক, তিনিও ঐ মাইনেতে ঢুকে বড়বাবু হয়েছেন।

প্রথম প্রথম বেশ চলে যাচ্ছিল। মাসের শেষে অভাবটা বাপের কাছে হাত পেতে মিটিয়ে নিতেন মহীতোষবাবু। ক্রমশ ছ-পাঁচ টাকা করে বছরে বছরে মাইনেও বাড়ছিল। তারপর একে একে বাবা মা ছ'জনেই গত হলেন। জমান কিছু টাকা হাতে পেলেন মহীতোষবাবু। কিন্তু যত আশা করেছিলেন তত নয়।

মহীতোষবাবুর স্ত্রী গঞ্জনা দিলেন, "এখন বললে কী হবে, যা খরচে লোক ছিলেন।"

অথচ খরচ যে সত্যি কী করে গেছেন তিনি, বোঝা গেল না। মহীতোষবাবুর তিন বোনের বিয়ে আর অসুখে বিসুখে ডাক্তার ওষুধ। এত মাইনে পেতেন, সব কি এইভাবে গিয়েছে?

মহীতোষবাবু এমনিতেই হিসেবী মানুষ, আরও হিসেবী হয়ে উঠলেন। মেয়ে দু'টোর বিয়ে দিতে হবে ত। ছেলেকে পড়াতে হবে ইস্কুলে কলেজে।

এক হাজার টাকা ইন্সিওর করেছিলেন। মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু করলেন। ব্যাঙ্কেও যখন যেমন পারতেন, বাঁচাতেন।

স্ত্রী কৃপণ বলত, মেয়েরা বায়না ধরত নতুন শাড়ির। তবু এতটুকু নড়চড় হতে দিতেন না তিনি।

বাপের জমান টাকাগুলো উড়ে গেল বড় মেয়ের বিয়ে দিতে। মহীতোষবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দেখলে ত। আরেকটা মেয়েকে পার করতে হবে। তাছাড়া, সমস্ত ভবিষ্যৎটাই···"

স্ত্রী বলত, "অত ভবিষ্যৎ ভাবলে চলে না। এখন খেয়ে পরে বাঁচলে তবে ত ভবিষ্যৎ।"

"আহা, না খেয়ে থাকার কথা ত বলছি না। তবে দু' হাতে না ওড়ালেই হল।"

স্ত্রী ঝাঁঝালো গলায় বলত, "মাইনে ত এতদিনে পাচ্ছ পঞ্চান্ন। একটা হাত ভরে না, তার আবার দু' হাতে ওড়াব!"

ধক্ করে একটু লাগত বুকে। তবু হাসি দিয়ে লজ্জা ঢেকে মহীতোষবাবু বলতেন, "তবু ত পঞ্চান্ন টাকা মাস গেলে পাচ্ছি। কিন্তু পঞ্চান্ন বছর বয়সে চাকরিটা ছেড়ে এসে যদি পনর বছর বাঁচতে হয়···"

স্ত্রী হাসত। "তখন তোমার অণিমারও বিয়ে হয়ে যাবে, আর মণ্টুও চাকরি করবে।"

"চাকরি ?" অবিশ্বাসের হাসি হাসতেন মহীতোষবাবু। বলতেন, "বাবা ছিল বড়বাবু, সাহেব ভালবাসত, তা বলে আমার ছেলেরও চাকরি হবে নাকি অত সহজে!"

স্ত্রী বুঝতেন, তর্ক করে লাভ নেই। রেগে গিয়ে বলতেন, "নাও, বাজারের হিসেবটা নাও..."

খাতা কলম নিয়ে বসতেন মহীতোষবাবু। "বল।"

"মাছ সাড়ে তিন আনা।"

"মাছ সাড়ে তিন আনা। তারপর ?"

"আলু সাত পয়সা।"

"আলু সাত পয়সা। হুঁ।"

"কয়লা সওয়া ন' আনা।"

খাতা থেকে চোখ তুলতেন মহীতোষবাবু। চোখ থেকে চশমা খুলতেন। তারপর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতেন, "ক' মণ কয়লা লাগছে মাসে ?"

ঐ এক কথা। ক' মণ কয়লা লাগছে, ক' সের তেল লাগছে, ভাত কেন ফেলা যায়। তার ওপর জিনিসের দাম ত আছেই।

আগে থলি হাতে নিয়ে নিজেই বাজারে যেতেন, মণ্টুটা বড় হয়ে কিছুতেই বাজারটা হাতছাড়া করতে চায় না।

বেশ খানিকটা ঝগড়াঝাঁটির পর আবার খাতা কলম নিয়ে হিসেব লেখা শেষ করে দু'টো টান মেরে মোট কষতেন। তিন তিনবার যোগ করে লিখতেন সাড়ে চোদ্দ আনা।

"বাকী ছ' পয়সা ?" মহীতোষবাবু প্রশ্ন করতেন।

"আবার ছ' পয়সা কোথায় পাব, সবই ত খরচ হয়েছে। ভাল করে যোগ করে দেখ।"

"যোগ আমি ভাল করেই দিয়েছি।"

আবার খানিকটা কথা কাটাকাটি হত। তারপর উপায় না দেখে মোট অঙ্কের নীচে মহীতোষবাবু লিখতেন, গরমিল—ছ' পয়সা।

মনটা বিষিয়ে যেত, গরমিলের জন্যে নয়। একটা টাকা খরচের জন্যে। আগেকার পাতাগুলো উল্টে দেখতেন, কোনদিন দশ আনা, কোনদিন সাত আনা। কিন্তু মাঝে মাঝে এই যে চাল, কয়লা, তেল ইত্যাদির মোটা খবচগুলো—দেখলেই ভয় পেতেন মহীতোষবাবু।

সত্যি, এভাবে খরচ করলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ভবিষ্যৎ কেন, বর্তমানও। তবুও মাঝে মাঝে বছবে একদিন ফুর্তি হত। মাইনে বাড়ার খবব শুনলেই। মাইনে বাড়ত। ছ' পাঁচ থেকে দশ পনর পর্যন্ত।

মাইনে বাড়াব সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য টাকা জমিয়েছেন আবও বেশী।

কিন্তু কী করে যেন খরচও বেড়ে গিয়েছে। ছেলেমেয়েদেব হালচাল বদলে গিয়েছে বলেই হয়ত।

মোটা শাড়ি আর পরতে চায় না অণিমা। অথচ বড় মেয়ে প্রতিমা পুজোয় প্রথম মিহি শাড়ি পেয়েছিল। ছেলেও তেমনি। কলেজে ঢুকেই ফুল শার্ট পরতে শুরু করল। সিকি গজ কাপড় বেশী খরচ।

স্ত্রী চটে যেতেন। "তুমি এখন আব তিরিশ টাকার কেরানী নও।"

না, ধাপে ধাপে চাকরিতে উন্নতি হয়েছে মহীতোষবাবুব। কেরানী থেকে ছোটবাবু। মাইনে ছ' শ পঁচিশ।

ইন্সিওর আর জমান টাকায় সাত হাজার হয়েছে। কিন্তু ছোট মেয়ে গলায় গলায়। সম্বন্ধ ঠিক হলেই তিনটি হাজার টাকা বের করতে হবে। মোটামুটি একটা সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে, বাঁকিপুরের ছেলেটি এবার আই এ দেবে।

স্ত্রী বলে, "অণির বিয়ে দিয়েই মণ্টুর বিয়ে দেব।"

চোখ কপালে তোলেন মহীতোষবাবু। "মণ্টুর? বি এ পরীক্ষা দিচ্ছে, চাকরি-বাকরি করুক, তারপর।"

"তুমি চাকরি করে বিয়ে করেছিলে?"

"করিনি বলেই ত সারাজীবন ঠ্যালা সামলাচ্ছি। না, না, উপায়ক্ষম না হলে ছেলের বিয়ে দেব না।"

ছেলের বিয়ের কথা পরে ভাবলেও চলবে। মেয়ের বিয়েটা আসল। ছেলের বাপ এসে মেয়ে দেখে, আর মহীতোষবাবু গিয়ে পণাপণ জিজ্ঞেস করেন। এদিক হয় ত ওদিক হয় না।

এইভাবে বছরের পর বছর যায়। এদিকে দু' শ পঁচিশ থেকে তিন-চার লাফে একেবারে চার'শ। ব্যাপার হল, যুদ্ধ লেগে গেছে তাই সাহেবরা অনেকে চলে গেছে। কেউ যুদ্ধে, কেউ ভাল চাকরি পেয়ে। আর ধাপে ধাপে উঠে এসে বড়বাবু হয়ে গিয়েছেন মহীতোষবাবু। সুতরাং আই এ পাশ ছেলের সঙ্গে ছোট মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না। রীতিমত গ্র্যাজুয়েট পাত্র চাই। মানে তিন হাজারে আর হবে না, পাঁচ হাজার।

পণের কথা শুনে চটে যান মহীতোষবাবুর স্ত্রী। যত ধান চালের দাম বাড়ছে, চাষীদের হাতে টাকা আসছে, খুশি মত সব পণ দিচ্ছে। বি এ পাশ ছেলে কি না পাঁচ হাজার?

মহীতোষবাবু হাসেন, "উঁহু, ব্ল্যাক, ব্ল্যাক! কালোবাজার বলে না? সেই কালোবাজার করে টাকা হয়েছে লোকের। বিয়ের পণেও তাই ব্ল্যাকমার্কেট হয়েছে।"

তবু উপায় নেই ; শেষ পর্যন্ত ঐ পাঁচ হাজারেই বিয়েটা দিয়ে দিতে হল মহীতোষবাবুকে।

তা বলে হিসেব এতটুকু আল্‌গা হতে দেননি। বাড়ি পাল্টাননি। কী হবে বেশী ভাড়া দিয়ে। ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে ত। কিন্তু হিসেবের খাতাটাই তাঁর হাতে, জিনিসের দাম ত তার হাতে নয়। মাইনে যত না বেড়েছে তার চেয়ে জিনিসের দাম।

সন্ধ্যেবেলায় চোখে চশমা এঁটে খাতা কলম নিয়ে বসেন মহীতোষবাবু। যথারীতি বলেন, "বাজারের হিসেবটা দাও।"

"মাছ দেড় টাকা।"

"দেড় টাকা ? কাল ত এক টাকা দু' আনা ছিল।

"চেঁচিয়ো না, জামাই রয়েছে ও-ঘরে।·· রসগোল্লা এনেছিল আট আনার।"

"নাঃ, বড্ড বেহিসেবী হয়ে যাচ্ছ। রসগোল্লা কি পেট ভরে খাবার জন্যে ? দু'টো দিলেই পার।"

স্ত্রী কথাগুলো গায়ে মাখে না। বলে, "আলু তের আনা।"

উপায় না দেখে লিখে চলেন মহীতোষবাবু।

"কয়লা এক টাকা দু' আনা।"

একে একে সব লিখে দু'টো লাইন টেনে যোগ করেন মহীতোষবাবু। তারপর খানিকটা কথা কাটাকাটির পর গরমিল লেখেন, এক টাকা দু' পয়সা।

শুধু এক টাকা দু' পয়সা নয়, সবই যেন কেমন গরমিল হয়ে যাচ্ছে। মাইনে বেড়েছে ধাপে ধাপে, মাছের সেরও আট আনা থেকে ধাপে ধাপে তিন টাকায় এসে পৌঁছেছে। ঠিক যতখানি বাঁচাতে চান তিনি, জমছে না তা। আর যা জমছে তা···

মনে মনে একটা হিসেব করে নেন মহীতোষবাবু। ইন্সিওর চার হাজার, ব্যাঙ্কে সাত হাজার, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটি

নিয়ে এগার হাজার। মোট বাইশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার গিয়েছে ছোট মেয়ের বিয়েতে। সেবার অসুখে চার মাস ভুগেছেন তা কোন না এক হাজার দেড় হাজার। দু' মাস ত আধা মাইনে ছিল। তারপর জামাইকে তত্ত্ব, পূজোর বাজার, ইত্যাদির বাড়তি খরচও আছে।

ছেলেটার চাকরি-বাকরি একটা হলে হয়, জিনিসপত্তরের দাম যা চড়চড় করে বাড়ছে। চাল, কাপড়, ওষুধ, এমন কি বাড়িভাড়াও।

এরই ফাঁকে একটা দুর্ভিক্ষ চলে গেল। সে কি সাংঘাতিক দৃশ্য। ভাবলেও শিউরে ওঠেন মহীতোষবাবু।

'ফ্যান দাও মা, 'ফ্যান দাও মা'—নাকী কান্নায় রাত একটা পর্যন্ত ঘুমোতে পেতেন না, বিরক্ত হতেন লোকগুলোর উপর। সকালে অফিস যাবার সময় ফুটপাতে সারি সারি মড়া পড়ে থাকতে দেখেও এতটুকু দুঃখ হত না। শুধু ভবিষ্যতের ভয়ে আঁতকে উঠতেন।

ভাবতেন, হাজার পনর টাকা ত হাতে পাব চাকরি ছাড়ার সময়। তাতে আর ক'টা দিন চলবে।

যাক, চালের দামটা বেড়ে আর দুর্ভিক্ষ হয়ে একটা কাজ হল। র‍্যাশনিং হল। র‍্যাশনিংয়ে একশ পঁচিশ টাকার চাকরি হল মণ্টুর।

স্ত্রী ধরে বসলেন, "এবার বিয়ে দাও ছেলের।"

তা দিতেই হয়। বিয়ের বয়স পার হতে চলল ছেলে। সুতরাং···

মেয়েটেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত।

বাপের অবস্থা দেখে বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে ছেলেটার। তিন-চার বছরের মধ্যে ছেলে-পিলে হল না।

ছেলে হল চার বছর বাদে। আর সেইবারেই চাকরি ছেড়ে

দিয়ে আসতে হল মহীতোষবাবুকে। সব মিলিয়ে দেখলেন, হাজার কুড়ি-বাইশ।

কিন্তু রোজগার শুধু মণ্টুর—মণ্টু নয়. এখন প্রিয়নাথ বলেন—একশ পঁচিশ। ঐ মাগগী ভাতাটা নিয়ে। কিন্তু খরচ কমিয়ে কমিয়েও আড়াইশ'র নীচে নামে না।

নাতিটা নাদুসনুদুস হয়েছে বটে, কিন্তু দুধ কি কম খায়? আর মেয়েরা মাঝে মাঝে আসে যায়, তাদের খরচ আছে।

যাক, ভগবান করুন, বেশীদিন না বাঁচতে হয়। কিন্তু সেই যে ছোটবেলায় ঠাকুমা বলেছিল, মাথায় যত চুল তত বছর পরমায়ু হোক, তাই যেন হতে চলেছে।

পাঁচটা বছর যেতে না যেতে বাইশ হাজারের অঙ্ক পনর হাজারে নেমে এল। নামছে না শুধু জিনিসের দাম। সব কিছুরই দাম বাড়ছে চড়চড় করে, দাম কমছে শুধু মানুষের।

"কইগো!" ডাকলেন মহীতোষবাবু।

"ডাকছ?" স্ত্রী এসে দাঁড়াল।

"হিসেবটা দাও। মাছ কত?"

"মাছ? মাছ কি রোজ আসে নাকি এখন?"

"ও! কয়লা এসেছে আজ?"

"হ্যাঁ, আধ মণ।"

"আধ মণ। এত কমে হচ্ছে এখন কী করে? আগে যে বলতে···

"আরও কমে হবে। তখন আর রান্নাই হবে না।"

হ্যাঁ, সবই কিছু কিছু খরচ কমান হচ্ছে। কমান হচ্ছে না, কমে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জমান টাকাও কমে যাচ্ছে মাসে মাসে।

"প্রিয়নাথ?" এবার ছেলেকেই ডাকলেন মহীতোষবাবু।

"ডাকছেন?" প্রিয়নাথ এসে দাঁড়ায়।

মহীতোষবাবু উসখুস করে বলেন, "মাইনে টাইনে না বাড়লে ত···

"মাইনে বাড়বে ?" হাসে প্রিয়নাথ। "শুনছি র‍্যাশনিং উঠে যাবে।"

উঠে যায়ও। তবে অন্য একটা চাকরি পায় প্রিয়নাথ। তারপর সেটাও যায়, আরেকটা।

মহীতোষবাবু বুঝতে পারেন, হিসেবটা কোথায় যেন গরমিল হয়ে যাচ্ছে। হুঁ, পনর হাজারটা নেমে এসেছে দশ হাজারে। তারপর দশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার থেকে ফুরুৎ।

নামতে নামতে হঠাৎ একদিন মহীতোষবাবু আবিষ্কার করেন, ছেলের গলগ্রহ হয়েছেন। জমান টাকা একটাও নেই। ছেলের মাইনে দেড়শ হয়েছে, কিন্তু নাতিটার ইস্কুলের মাইনে যা, প্রিয়-নাথের বেলায় কলেজে অত দিতে হয়নি। অসুখ হলেই আজকাল ছ' টাকার ওষুধ লাগে।

মাঝরাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকেন। বলেন, "কী হবে বল ত!"

স্ত্রী রেগে যায়। "কেন, তুমি ত হিসেবী মানুষ, ভবিষ্যৎ ভাবতে দিনরাত।"

"হুঁ, তা ত ভেবেছি। কিন্তু আমার হিসেবটা যে মিলল না গো। টাকায় যখন পনর সের চাল, তখন না খেয়ে টাকা জমিয়েছি। সুদে বেড়ে যা হাতে পেলাম, তাতে দু' সের চাল হয় না।"

স্ত্রী রেগে যায়। "তখন পই পই করে বলিনি, এখন খেয়ে বাঁচি শেষজীবনে নয় ভিক্ষে করব।"

মহীতোষবাবু হেসে বলেন, "ভিক্ষে ত করতেই হবে।"

"তা হবে, কিন্তু তখন খেলে ভাবতুম, একদিন পেট ভরে খেয়েছি। পেট ভরে খেতেও পেলাম না, ভিক্ষেও করতে হল।"

মহীতোষবাবু চুপ করে বসে থাকেন। কী যেন ভাবেন।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, "কেন এমন হল বল ত?"

স্ত্রী কর্কশ গলায় বলে, "কেন আবার, কপাল।"

"কপাল? তাই হবে হয়ত।"

পরের দিনই খুঁজে খুঁজে পুরনো তোরং থেকে কোষ্ঠীটা বের করলেন মহীতোষবাবু। যখন ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছিল, তখন একবার কোষ্ঠী নিয়ে বসেছিলেন। ধাপে ধাপে একেবারে নীচের তলায় নেমে এসে আবার কোষ্ঠীটা খুলে বসলেন।

দিনরাত কেবল কোষ্ঠীটা মেলে ধরে দেখেন মহীতোষবাবু। আঁকজোক কষেন, পাঁজি দেখেন। আর মাঝে মাঝে বলেন, "শনির বক্রীটা কেটে গেলে হয়ত···"

কিংবা, বৃহস্পতি চতুর্থে এসে পড়লেই···কখনো, মঙ্গল ব্যয়স্থ রয়েছে···

শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায় মহীতোষবাবুব স্ত্রীব। বলেন, "কী কচ্ছ দিনরাত। নিজের কুষ্ঠীটা নিয়ে বসে না থেকে, রাস্তায় গিয়ে বসলেও তো পার খড়ি পেতে, দু'টো পয়সা আসে।"

বোকার মত হাসেন মহীতোষবাবু। "বলছ?"

"হ্যাঁ বলছি, কেন শুনতে পাচ্ছ না, কানের মাথা খেয়েছ?"

হাসেন মহীতোষবাবু অপ্রতিভের মত। বলেন "তা মন্দ নয়, দু'টো পয়সা···"

* * *

"তা রাহু আপনার অষ্টম থেকে সরে গেলেই···"

পার্কটার পাশ দিয়ে ফিরে আসতে আসতে কথাটা শুনেই তন্ময়তা ভেঙে গেল।

কী ছাইভস্ম ভাবছিলাম এতক্ষণ।

কিন্তু···কই না, এতো অন্য একজন গণৎকার।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। না, যেখানটায় মহীতোষবাবু একটু আগে বসেছিলেন, সেখানে নেই। শুধু ফুটপাতের উপর খড়ির দাগগুলো পড়ে আছে। পুঁথিপত্রও নেই, মহীতোষবাবুও নেই।

হিসেবে বোধহয় আবার গরমিল হয়ে গিয়েছে মহীতোষবাবুর। হিসেবের খাতাটাই আছে মহীতোষবাবুদের হাতে, হিসেব লেখবার মালিক হলে কী হবে, হিসেব ঠিক করবার মালিক ত নন।

একটি কিংবদন্তী

ইতিহাসের পাতা থেকে যা তুলে আনা যায় তা নিটোল কোন গল্প হতে পারে না। যা গল্প তা ষোল আনা ইতিহাস নয়। তবু কোথায় যেন একটা মিলনক্ষেত্র আছে। মেঘের রঙ নীল, তবু কোন কোন দিন অস্তসূর্যের ছটা লেগে পশ্চিমের আকাশ রাঙা হয়ে ওঠে; তেমনি ইতিহাসের আকাশেও কল্পনার উত্তাপ লেগে অতীতের কঙ্কাল যেন রক্তমাংসের স্পর্শ নিয়ে আসে নতুন করে।

রক্তমাংসের উত্তাপ নিয়েই একদিন সেই রহস্যময়ী এসে দাঁড়িয়েছিল গৌড় ও বঙ্গের অধিপতি বল্লাল সেনের সামনে।

রাজা বল্লাল তখন তাঁর প্রমোদকাননে চলেছেন।

দরবার থেকে বেরিয়ে রাজসাগরের দীঘি পার হয়ে প্রমোদ কাননের পথে যেতে যেতে হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন রাজা বল্লাল!

বিস্ময়ের চোখ তুলে আবার ফিরে তাকালেন তিনি। সন্ধ্যা-পূর্বের রক্তিম আলোকে দেখলেন বকুল গাছটির তলায় একটি পরমাসুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়ে আছে অভিসারিকার মত।

রাজা বল্লাল ফিরে তাকাতেই তার অপাঙ্গে মৃদু কৌতুকের হাসি ছিটিয়ে দিয়ে লজ্জায় অধোবদন হল সেই রহস্যময়ী।

বিস্মিত হলেন বল্লাল। তার দিকে এগিয়ে যাবার ইচ্ছা হল তাঁর। পরক্ষণেই বিবেকের কষাঘাতে স্তব্ধ হলেন বল্লাল। দ্রুতপায়ে প্রমোদ উদ্যানের দিকে চলে গেলেন মনের বাসনা মনে রেখে।

কিন্তু হৃদয়ের পট থেকে বুঝি মুছে ফেলা যায় না সেই রূপবতী নারীর ছবি।

গোপন বুকে মধুময় এক গুঞ্জরন শুরু হয়। ক্ষণে ক্ষণে অপ্রাপ্য কামনার ব্যথায় গুমরে ওঠেন রাজা বল্লাল।

নিদ্রাহীন নিশীথ কেটে যায়, দিনের ব্যস্ততার মাঝেও বারংবার মনে পড়ে সেই একটি কৌতুকহাস্য।

পরদিন সন্ধ্যায় দরবার থেকে বিদায় নিয়ে আবার প্রমোদ কাননের পথ ধরেন বল্লাল। হৃদয় উৎসুক হয়ে চেয়ে থাকে।

রাজ-সাগরের দীঘি পার হয়ে সেই বকুল গাছটির দিকে ফিবে তাকান বল্লাল। আশান্বিত চোখ তৃপ্ত হয়। তেমনি অভিসারিকার বেশে বকুল গাছটির নীচে দাঁড়িয়ে আছে সেই রূপসী নারী।

শরীরে তার যৌবনের উচ্ছল ঝর্ণা যেন কেঁপে ওঠে। কি এক অসহ্য আকর্ষণ। কি এক উত্তপ্ত নেশা। সে রূপের মোহজালে বল্লালের সমস্ত শরীর মন নিস্তেজ হয়ে যায়। তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় এমন অপরূপ সুন্দরী কোন নারীকে দেখেন নি বল্লাল। এ যৌবনশিখার আগুনে সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত পরাক্রম পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে চলেন রাজা বল্লাল। কয়েকটি পদক্ষেপ, তারপরই চকিতে চমকে ওঠেন তিনি। প্রবল প্রতাপ বাজরাজেশ্বর তিনি, যৌবনকে পরিপূর্ণ উপভোগ করে বার্ধক্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি আজ ধর্মরক্ষক, সনাতন ধর্ম আর কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তক। প্রাসাদে ধর্মভীরু পট্টরানী, আর জীবনের প্রিয়তম পুত্র সুদর্শন লক্ষণসেন।

চকিতে নিজেকে সংযত করে প্রমোদ উদ্যানে চলে গেলেন বল্লাল, আর সেই মুহূর্তে পিছন থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠের উচ্চকিত কৌতুকহাস্য।

সে হাসি জ্বালা ধরিয়ে দিল বল্লালের মনে। উচ্চকিত উপহাস যেন বলে উঠল, রাজা বল্লাল এক নারীর হাতছানিকে ভয় পায়।

মনের মধ্যে বারংবার গুঞ্জন তোলে সেই অপরূপার কামনা-মদির কটাক্ষ। সুরা আর সুরসাধিকাদের চেয়েও এ যেন এক তীব্রতর নেশা।

তৃতীয় দিনেও প্রমোদ কাননে যাবার পথে বকুল গাছটির তলায় সেই পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখতে পান রাজা বল্লাল। ন্যায় অন্যায় বোধ লুপ্ত হয় তাঁর। মনের শান্তি হরণ করেছে এই রূপময়ী, সমস্ত ঐশ্বর্যের মাঝেও রাজা বল্লালের হৃদয় মনকে করেছে হৃতসর্বস্ব দরিদ্র ভিখারী।

ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে যান বল্লাল।

প্রশ্ন করেন, কে তুমি?

সশব্দ উচ্চকিত হাসি হেসে সে বলে, আমি পদ্মিনী।

বল্লাল প্রশ্ন করেন, কি চাও তুমি?

সুমধুর সুরের মত তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। বলে, কি চাই? হতে চাই রাজা বল্লালের জীবনরঙ্গিণী।

বিস্মিত হন পক্ককেশ রাজা বল্লাল। হৃতযৌবন এক বৃদ্ধের প্রেম আকাঙ্ক্ষা করে এক সদ্যোভিন্নযৌবনা তিলোত্তমা।

তবে কি তাঁর ঐশ্বর্যের লোভে, বিলাসবৈভবের লোভেই উপযাচিকা হয়ে এসেছে এই অষ্টাদশী? কিন্তু তার অপরূপ দু'টি চোখের শান্ত সমুদ্রে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন বল্লাল।

মুগ্ধ আবেশে তার কোমল হাতখানি তুলে নিয়ে বলেন, চল পদ্মিনী। আমার প্রমোদ উদ্যানের তুমি হবে শ্রেষ্ঠ কুসুম।

অনিমেষ নয়নে দিনের পর দিন পদ্মিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন বল্লাল। শুধু রাজা বল্লাল নয়, পদ্মিনীকে খুশি করার

জন্য যেন প্রাসাদের প্রতিটি পাষাণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করে আছে।

পদ্মিনীর ইচ্ছাই যেন বল্লালের আদেশ।

জীবনে অনেক ঐশ্বর্য দেখেছেন বল্লাল, অনেক শক্তির অপচয় ঘটেছে, কিন্তু তাঁর রাজশক্তি রাজৈশ্বর্য যে অগণিত রূপসী নারীকে জয় করে নিয়ে এসেছে, তারা কেউ এমন ভাবে স্বেচ্ছায় উপযাচিকা হয়ে এসে দাঁড়ায়নি। কেউ বলে নি, চাই শুধু প্রেম। বলেনি, বাহুর আলিঙ্গনই শ্রেষ্ঠ কণ্ঠহার।

পদ্মিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজকার্য ভুলে যান গৌড়-অধিপতি। প্রাসাদের পট্টরানীর আহ্বান উপেক্ষা করেন, অপেক্ষার অভিমান বুকে নিয়ে ফিরে যায় একমাত্র পুত্র লক্ষ্মণসেন। রাজমন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ, সভাপণ্ডিত সকলেই দরবারের শূন্য সিংহাসনের সামনে বসে চাপা কণ্ঠে আলোচনা করেন রাজা বল্লালের বিচিত্র ব্যবহারের।

ধার্মিকশ্রেষ্ঠ বঙ্গাধিপতির চরিত্রের পরিবর্তন মনে হয় দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময়। রাজ্যের ব্রাহ্মণকুল বিশ্বাস করেছে, প্রজারা বিশ্বাস করেছে, গৌড় ও বঙ্গে সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা চান বল্লাল। ধর্মরক্ষার জন্যেই বুঝি নতুন নতুন বিধান দিয়েছেন তিনি দিনের পর দিন। কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেছেন তিনি, সেও বুঝি প্রজাকে উন্নত করে তোলার জন্যেই।

তাই রাজা বল্লালের চরিত্র দুর্বোধ্য মনে হয়। অসন্তোষের গুঞ্জন শুরু হয় প্রজাদের মধ্যে। উপপত্নীর প্রেম বিলাসে এ-ভাবে নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে দেওয়া সাজে না রাজা বল্লালের।

অসন্তোষের গুঞ্জন পদ্মিনীর কানেও এসে পৌঁছয়।

সচেতন করে তোলার চেষ্টা করে পদ্মিনী।

বলে, কত রাজকার্য অপেক্ষা করে আছে দরবারে, প্রজারা আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী মহারাজ।

বল্লাল মৃদু হেসে বলেন, রাজকার্য! সে দায়িত্ব তো তোমার হাতে তুলে দিয়েছি পদ্মিনী। তোমার আদেশই রাজার আদেশ।

স্তুতি শুনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পদ্মিনীর দু'টি চোখ। বলে, পদ্মিনী যদি রাজা বল্লালেব এত প্রিয়, তবে তার একটি অনুরোধ রক্ষা করুন মহারাজ।

বল্লাল সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকান তার দিকে।

মৃদু হেসে পদ্মিনী বলে, যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে রাজা বিজয় সেন বরলাভ করে পেয়েছিলেন এই রাজা বরলালকে সেই যজ্ঞ করতে চাই মহারাজ।

পুত্রেষ্টি? খুশি হয়ে বল্লাল বলেন, তাই হোক।

আদেশ রটে যায় দিকে দিকে। নিমন্ত্রণ পৌঁছে যায় আব্রাহ্মণ সকলের কাছে।

সকলের কাছে?

না, নীচজাতীয় প্রজাদের প্রবেশ নেই এ প্রাসাদে। শুধু তাই নয়, রাজা বল্লালই একদিন বিধান দিয়েছিলেন, নীচজাতীয়, নীচকুলোদ্ভবের সংস্পর্শ-দোষ ঘটলে পতিত হতে হবে তাকে। সমাজের মর্যাদা হারাতে হবে।

সভার পণ্ডিতবর্গ সাধুবাদ দিয়েছিল এ আদেশ শুনে। বলেছিল, রাজা বল্লাল তাঁর প্রজাবর্গকে শুদ্ধাচারী করে তুলছেন নিত্য নতুন বিধান দিয়ে।

আর তা শুনে তৃপ্ত হয়েছিলেন রাজা বল্লাল। তৃপ্ত হয়েছিলেন এই ভেবে যে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য কেউই বুঝি জানতে পারে নি। ব্রাহ্মণের একতাকে ভয় পেতেন তিনি, তাই কৌলীন্যের প্রাচীব গেঁথে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন তাদের মাঝে। বৈশ্যকেও ভয়

পেতেন বল্লাল। ভয় পেতেন বৈশ্যকুলপতি শ্রেষ্ঠী বল্লভানন্দের ধনশক্তিকে। জানতেন, বল্লভানন্দের ইঙ্গিতে সমগ্র বৈশ্য প্রজারা এসে দাঁড়াতে পারে শ্রেষ্ঠীর পিছনে। জানতেন, ধনী বল্লভানন্দের অর্থলোভে তাঁর প্রতিটি সৈনিকের হাতের অস্ত্র খসে পড়তে পারে যে-কোন মুহূর্তে।

প্রজাকে বিদ্রোহী করে তুলতে পারে এক ব্রাহ্মণ, আর বৈশ্য। ব্রাহ্মণকে দুর্বল করেছেন রাজা বল্লাল, শ্রেষ্ঠী বল্লভানন্দকে পতিত করে দুর্বল করে দিতে চান শ্রেষ্ঠী সমাজকে।

সুযোগ খোঁজেন রাজা বল্লাল। দেবদত্ত আশীর্বাদের মত সুযোগ মিলে যায় অকস্মাৎ।

সেদিন সিংহাসনে বসে ছিলেন তিনি। হঠাৎ দরবার প্রাঙ্গণ থেকে ভেসে এল রোষদীপ্ত কণ্ঠের চিৎকার।

কুন্দন আচার্য এসে দাঁড়ালেন সামনে। পিছনে নগরপাল আর পাশবদ্ধ শ্রেষ্ঠী মণি দত্ত।

চমকে ফিরে তাকান বল্লাল, ফিরে তাকান মণি দত্তের মাতুল বল্লভানন্দ শ্রেষ্ঠী।

রুষ্ট ব্রাহ্মণের দিকে তাকিয়ে বল্লাল প্রশ্ন করেন, কি অভিযোগ আচার্য ?

কুন্দন আচার্য চিৎকার করে বলেন, বিশ্বজিৎ যজ্ঞকালে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে একটি সোনার গাভী দান করেছিলেন, স্মরণ আছে মহারাজ ?

বল্লাল বলেন, সে-কথা আমি বিস্মৃত হইনি আচার্য।

কুন্দন আচার্য বলেন, মহারাজ, এই দ্বিজের পত্নী প্রয়োজনে সেই স্বর্ণধেনু গচ্ছিত রেখেছিলেন এই বিশ্বাসঘাতক শ্রেষ্ঠী মণি দত্তের কাছে।

তারপর ?

কুন্দন আচার্য অভিযোগ করেন, মণি দত্ত এখন স্বর্ণধেনু গচ্ছিত রাখার কথা অস্বীকার করছে মহারাজ।

বল্লাল মনের উল্লাস গোপন রেখে নগরপালের দিকে তাকান।

নগরপাল বলেন, মণি দত্তের গৃহ থেকে এই স্বর্ণপিণ্ড উদ্ধার করেছি মহারাজ।

নগরপালের কথা শুনে শ্রেষ্ঠী মণি দত্ত সহাস্যে বলে, শ্রেষ্ঠীর গৃহে আরও অনেক স্বর্ণপিণ্ড পাবেন মহারাজ। আমি স্বর্ণ-বণিক, দরিদ্র ব্রাহ্মণ নই।

ধীরে ধীরে সিংহাসন থেকে নেমে এলেন বল্লাল, স্বর্ণপিণ্ড হাতে নিয়ে বল্লভানন্দকে বললেন, পরীক্ষা করে দেখুন শ্রেষ্ঠী, স্বর্ণধেনুর অষ্টধাতু ও অলক্তক এই পিণ্ডে আছে কিনা।

বল্লভানন্দ পরীক্ষা করে বললেন, না মহারাজ, আপনার প্রদত্ত স্বর্ণধেনুর অষ্টধাতু ও অলক্তক এই পিণ্ডে অনুপস্থিত।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন কুন্দন আচার্য। বললেন, মণি দত্তের মাতুল এই বল্লভানন্দ। তার পরীক্ষাকে বিশ্বাস করি না মহারাজ।

বল্লাল বললেন, তথাস্তু আচার্য, বারাণসীর স্বর্ণকার এসে পরীক্ষা করবে এই স্বর্ণপিণ্ড।

নিমন্ত্রণ চলে গেল বারাণসীতে। গোপনে এসে উপস্থিত হল বারাণসীর স্বর্ণকার। পরীক্ষা শেষে স্বীকার করল, সে স্বর্ণপিণ্ডেও আছে অষ্টধাতু আর অলক্তক।

ক্রোধান্ধ বল্লাল সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, সুবর্ণকীট বল্লভানন্দ, তুমি কৃমিকীটের চেয়েও অধম। মিথ্যা-ভাষণের জন্যে এই মুহূর্ত থেকে তোমাকে আমি পতিত করলাম।

বিস্ময়ে, আহত অভিমানে দরবার ছেড়ে চলে গেলেন

বল্লভানন্দ। সামাজিক মর্যাদার শিখর থেকে অপমানের অন্ধকার গহ্বরে বল্লভানন্দকে ফেলে দিলেন বল্লাল।

কান্নার রোল উঠল শ্রেষ্ঠীর গৃহে, অপমানে লজ্জায় রাজধানী ত্যাগ করে চলে গেলেন শ্রেষ্ঠী বল্লভানন্দ। পতিত হয়েছেন তিনি, পতিত অপবাদের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

এদিকে অনুশোচনায় দগ্ধ হলেন, রাজা বল্লাল। তাঁর কৌশল সফল হয়েছে, আতঙ্ক অপসৃত হয়েছে রাজ্য থেকে।

তবু কোন কোন মুহূর্তে বিমর্ষ হয়ে পড়েন তিনি।

এমনি এক বিমর্ষক্ষণেই বুঝি প্রমোদ কাননে চলেছিলেন তিনি।

প্রমোদ কাননের পথে বকুল গাছটির তলায় দেখা পেয়েছিলেন পরমাসুন্দরী পদ্মিনীর। এই অপ্সরীতুল্যা নারীর দু'চোখের শান্ত সমুদ্রে শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন।

তাই পদ্মিনীর কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখতে চান নি তিনি।

সেই পদ্মিনী বাসনা জানিয়েছে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের।

আদেশ দিয়েছেন বল্লাল। প্রস্তুতি শুরু হয়েছে যজ্ঞ ভূমিতে।

বার্তা রটে যায় দিকে দিকে। আর অন্দর মহলে লুটিয়ে পড়ে গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠেন রাজপত্নী।

এদিকে যজ্ঞভূমিতে এসে উপস্থিত হয় ব্রাহ্মণকুল।

সদ্যস্নাতা পদ্মিনী পট্টবস্ত্রে বিভূষিতা হয়ে যজ্ঞাগ্নির সামনে এসে দাঁড়ায়।

পিতৃপরিচয় জানতে চান রাজপুরোহিত।

প্রশ্ন করেন, বল মা, কার কন্যা তুমি, কোন বর্ণ?

পদ্মিনীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অকস্মাৎ।

চিৎকার করে পদ্মিনী বলে ওঠে, আমি হড্ডিকা, নীচতম কুলের কন্যা। কিন্তু, আমি রাজা বল্লালের উদ্যান কুসুম।

এ ঘোষণা শুনে বজ্রাহতের মত নিশ্চুপ হয়ে যায় সমগ্র যজ্ঞভূমি।

নীচকুলের সংশ্লিষ্টতা দোষের ভয়ে ব্রাহ্মণের দল ছুটে পালায়। এ কি অনাচার রাজা বল্লালের? একজন অস্পৃশ্যা রমণীকে অঙ্কশায়িনী করেছেন ধর্মভীরু বাজা বল্লাল।

ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন রাজপুরোহিত। বলেন, আপন বিধানে আপনিই পতিত হলে তুমি। আজ থেকে ধর্মরক্ষক বল্লালকে ঘৃণার চোখে দেখবে তার প্রজাকুল।

অন্দরমহলেও এ খবর পৌঁছে যায়।

ক্রোধে আত্মগ্লানিতে উন্মাদ হয়ে ওঠেন বাজপত্নী। রাজা বল্লালের সংস্পর্শ-দোষ ঘটলে একমাত্র পুত্র লক্ষ্মণসেনও পতিত হিসেবে স্বীকৃত হবে।

অস্পৃশ্যাকে ত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত কবার অনুবোধ জানিয়ে পুত্র লক্ষ্মণসেনকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্য ত্যাগ কবে যান রাজপত্নী।

ব্রাহ্মণকুলের অভিশাপ, পত্নী ও পুত্রের অভিশাপে দিশে-হারা হয়ে পড়েন বল্লাল। একমাত্র পুত্র, সুবিস্তৃত রাজ্যের উত্তরাধিকারী, প্রাণের সবচেয়ে যে আপন সেই পুত্র পিতাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। সংসারের শূন্য দেউল হাহাকাব করে ওঠে। প্রাসাদ নিস্তব্ধ। প্রমোদ-উদ্যান যেন শোকে মুহ্যমান।

জীবনের শেষ আশ্রয় পদ্মিনী। কপটাচারী পদ্মিনী! আপন পরিচয় গোপন রেখে বৃদ্ধ বল্লালের বুকে সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছে সে। তবু পদ্মিনীকে ত্যাগ করতে পারেন না বল্লাল।

ধীবে ধীরে আবার পদ্মিনীর পাশে এসে দাঁড়ান বল্লাল। ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়ান।

তারপর প্রশ্ন করেন, তুমি হড্ডিকা, তুমি নীচজাতীয়া, এ-কথা কেন গোপন রেখেছিলে পদ্মিনী?

প্রশ্ন শুনে হঠাৎ সশব্দ অট্টহাসে উন্মাদের মত হেসে ওঠে পদ্মিনী। চিৎকার করে বলে ওঠে, আমি হড্ডিকা নই বল্লাল। আমি শ্রেষ্ঠী বল্লভানন্দের কন্যা।

তারপর গঙ্গার স্রোতধারার দিকে ছুটে যায় পদ্মিনী।

—পদ্মিনী ! পদ্মিনী ! চিৎকার করে ওঠেন বল্লাল।

সে-ডাক শুনে উচ্চকিত অট্টহাসে হেসে ওঠে পদ্মিনী। চিৎকার করে বলে, বল্লভানন্দকে পতিত করেছিলে বল্লাল, তোমাকে পতিত করেছি আমি, পদ্মিনী।

আবার পাগলের মত চিৎকার করে ওঠেন বল্লাল।

—পদ্মিনী ! পদ্মিনী !

সাড়া নয়, ভেসে আসে পদ্মিনীর সশব্দ উপহাস। যে উপহাস একদিন ভেসে এসেছিল সেই বকুল গাছটির তলা থেকে।

গঙ্গার স্রোতধারার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে পদ্মিনী চিৎকার করে বলে, আমার সত্য পরিচয় কেউ জানবে না বল্লাল, কেউ জানবে না, হড্ডিকা নয়, বল্লালকে পতিত করে গেছে পতিত বল্লভানন্দের কন্যা।

তবু চিৎকার করে ডেকে ওঠেন বল্লাল, পদ্মিনী, পদ্মিনী !

পদ্মিনী নয়, শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে আসে।

---

* বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—৺দুর্গাচন্দ্র সান্যাল।

মম নিশ্চয়ই এ গল্পটা অন্যভাবে বলতেন। অর্থাৎ স্রেফ দু'টি পুরুষমানুষ বাসের ভিড়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হাওড়া থেকে শিয়ালদা অবধি এসে পৌঁছল, আর বাসটা মৌলালীর দিকে মোড় ফিরতেই একজন নেমে পড়ল—এমন নীরস গল্প মম অন্তত লিখতেন না। বেদান্ত নিয়ে যতই নাচানাচি করুন তিনি, সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যত পরিচয়ই থাক না কেন, রস বলতে তিনি আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র আর শান্ত এই নব-রসের প্রথমটিকেই প্রাধান্য দিয়ে আসছেন। সুতরাং তিনি লিখতেন : তিনি ঠিক যে কি লিখতেন তা বলতে পারি না। তবে আমার পাশের লোকটি, যার সম্পর্কে গল্পটা ফাঁদতে বসেছি, তাকে হয়ত নারীরূপেই দেখতেন তিনি। কিন্তু তা হলে আমার গল্প অন্যমুখে চলে যেত। তাই যেমন যেমন ঘটেছিল সেইটুকুই আমি বলছি।

কোলকাতা শহরে সেদিনই আমি প্রথম এসেছি এবং সেই মুহূর্তে। কোটের ভেতরের পকেটে শ' দুয়েক টাকার স্পর্শে বুক দুরুদুরু করছে। মফঃস্বল শহরের একটি ওষুধের দোকানে এক নাগাড়ে তিন বছর কাজ করার ফলে মালিকের কাছে বিশ্বস্ত প্রমাণিত হয়েছি তখন, আর আজীবন প্রবাসী হওয়ার দরুণ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ হলেও আমি যে শিক্ষিত তাও বিশ্বাস করেছেন তিনি। তাই কর্মজীবনে সেই প্রথম শ' দুয়েক টাকা দিয়ে মালপত্র কিনতে পাঠিয়েছিলেন তিনি, আর বারবার সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন : কোলকাতা হল গুণ্ডা চোর পকেটমারের

রাজত্ব, অতএব সাবধানে যাওয়া আসা করো। এতদিন যে লোকটি কোলকাতাকে শিক্ষা আর সভ্যতার এভারেস্ট বলে জাহির করে এসেছেন, তিনিই যখন বলে বসলেন; কোলকাতা পকেটমারের রাজত্ব, তখন ভয় পেলাম সত্যিই। কারণ তখন পর্যন্ত কোলকাতা চোখে দেখিনি।

পাঁচ জনকে জিজ্ঞেস করে ভিড় ঠেলে ঠেলে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে দাঁড়ালাম। ইচ্ছে ছিল, একটা খালি বাসে উঠব। কিন্তু সে আশা ছেড়ে দিয়ে ভিড়ের মধ্যেই উঠতে হল।

প্রুস্ত অবশ্য এমন একটা সুযোগকে দু' লাইনে শেষ করতেন না। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বর্ণনা করে যেতেন তিনি নিখুঁত ছবি আঁকার ভাষায়। হয়তো হাওড়া স্টেশনের বর্ণনাই দিতেন তিন পাতা জুড়ে, তারপর বাস স্ট্যাণ্ডের বর্ণনায় যেত আরো দু'পাতা এবং সর্বশেষে এই বাসের ভিড় এবং আমার মনের অবস্থাকে প্রকাশ করার জন্যে খরচ করতেন আরো দু'পাতা। আমি প্রুস্ত নই, সুতরাং যা যা ঘটেছিল তা সংক্ষেপেই বলছি। আপনারা কেউ যদি এ ঘটনা থেকে কোন গল্প বানাতে পারেন আপত্তি করব না।

ভিড় ঠেলে বাসে তো উঠলাম। বাসের সঙ্গে বসার যে কোন সম্পর্ক নেই, অবহিত হতে সময় লাগল না। ওপরের রডটি ধরে বাদুড় ঝোলা ঝুলতে শুরু করলাম বাস ছেড়ে দিতেই। এতগুলি লোকের নিঃশ্বাস, গায়ের ঘাম, কিচির মিচির। আমার ওষুধের দোকানের মালিক বলে দিয়েছিলেন সাবধানে থাকতে, কিন্তু আমার মন বলল, বারবার বুকে হাত দিয়ে নোটের তাড়াটার স্পর্শ নেয়া বোকামির কাজ হবে। কারণ, নেহাত যদি কারো চোখ থাকে তার দিকে, তাহলে আমার ব্যবহারই বুঝিয়ে দেবে যে পকেটে টাকা আছে।

তাই একেবারে কপর্দকহীন যাত্রীর মত নির্বিকার ভাব ফোটাবার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম পাশের ভদ্র-লোকের কথায়।

—পকেট সামলে চলবেন সকলে! একটা সাবধানী চিৎকার ছাড়লেন ভদ্রলোক।

ফিরে তাকালাম তাঁর মুখের দিকে; দেখলাম সে মুখে মিটিমিটি হাসি। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললাম, পকেটে আছে কি যে সাবধান হব।

ভদ্রলোকও হাসলেন। বললেন, আপনার না থাকতে পারে, যাঁর আছে তাঁকে সাবধান করে দিচ্ছি।

এদিকের আরেকজন বলে উঠলেন, তা যা বলেছেন। মাঝে মাঝে দু'একটা শুনছি বটে আজকাল।

—দু'একটা? ভদ্রলোক প্রতিবাদ করলেন।—হামেশা হচ্ছে মশাই, হামেশা। এই তো পরশু দিন, এক বুড়ো ভদ্রলোক সবে মাসের মাইনেটি পেয়েছেন, হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন বাসের মাঝখানে। বাসের সবাই মিলে দু'পয়সা করে চাঁদা দিয়ে তার বাড়ী ফেরবার পয়সা দিলাম।

কথাটা শুনে মনে মনে শঙ্কিত হচ্ছিলাম। তবু বললাম, টাকা নিয়ে যাবার সময় একটু সাবধান হলেই পারেন, তা তো হবেন না কেউ।

—সাবধান! হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, পকেটমারদের কাছে সাবধান হবেন? তাদের টেকনিক জানেন?

বললাম, না তো।

—শুনুন তবে। বলে বাসের জানালায় একবার উঁকি দিয়ে দেখলেন ভদ্রলোক, বাসটা ব্রিজ পার হল কিনা।

তারপর শুরু করলেন গল্প। বাসের ভিড়, তার ওপর ঝুলতে

ঝুলতে যাওয়া। মন্দ লাগছিল না ভদ্রলোকের কথাগুলো। বললেন, পকেটমারদের সাইকোলজির জ্ঞান আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। দু'শো গজ দূর থেকে বলে দেবে কার পকেটে টাকা আছে।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, তাই নাকি?

—বিশ্বাস করছেন না? রীতিমত চটে উঠলেন ভদ্রলোক।—শুধু টাকা আছে কিনা নয়, কত টাকা আছে সঙ্গে তাও আন্দাজে বলে দিতে পারে। আর পকেটমার মানে তো একজন নয় একটি দল। স্টেশনের কুলি থেকে শুরু করে বাসের কণ্ডাক্টরদের সঙ্গেও সাট থাকে তাদের।

—সে কথা সত্যি! সায় দিলেন অন্য একজন।

ভদ্রলোক বললেন, যেই একজন ইশারায় জানিয়ে দিল অমুক লোকটার পকেটে বেশ কিছু আছে, অমনি টেলিগ্রাফ হয়ে গেল চোখে চোখে। তিন চারজনে মিলে এমন গায়ের ওপর এসে পড়বে টেরও পাবেন না যে তারা পকেটের মালটা ওজন করে নিল। তারপর বাসের মুখটিতে দাঁড়িয়ে থাকবে এমন ভাবে, যেন তারাও যাত্রী।

—হ্যাঁ, সে অবশ্য প্রায়ই দেখি। টিপ্পনি কাটলেন অন্য একজন।

ভদ্রলোক উৎসাহ পেলেন যেন। বললেন, আঙুলের সঙ্গে ব্লেডের মত ধারালো একটা ছুরি দিয়ে স্রেফ পকেটটি সদর করে দেবে কখন টেরও পাবেন না। তার সঙ্গে মালটি যে হাতে হাতে কোথায় চলে যায়, বুঝতেও পারবেন না। হাতেনাতে ধরলেন হয়ত তাকে, কিন্তু শেষকালে নিজেই অপদস্থ হবেন। টাকা অন্য কোথাও চলে গেছে, বাসের লোকদের সার্চ করেও পাবেন না।

—সে মশাই আমি স্বচক্ষে দেখেছি একবার। মন্তব্য করলেন একজন।

ভদ্রলোক বললেন, তবে অনেকে আবার একটু চালাক চতুর হয়, একটু সাবধানে থাকে। তাদের বেলায় অবশ্য অত সহজে কাজ সারতে পারে না পকেটমাররা। ধাক্কা ধাক্কি দিলেও হয়ত পকেট সামলে রাখছে লোকটি, তখন আরেক কায়দা করে। চট করে কয়েকটা খুচরা পয়সা ফেলে দেয়, আর লোকটি আচমকা পয়সার শব্দে ভাবে তার পকেট থেকেই পয়সা পড়েছে···আর যেই অন্যমনস্ক হয়ে পয়সা কুড়োতে যায় অমনি ··বুঝলেন কিনা। হাসতে শুরু করে ভদ্রলোক।

এমন একটা সুযোগ পেলে শেক্সপিয়ার চমৎকার একটা নাটক লিখে ফেলতেন হয়ত। সামান্য একটা রুমাল ফেলে দিয়ে ওথেলো নাটকটায় কি কাণ্ডই না বাঁধিয়েছেন তিনি। দর্শকরা নিশ্বাস বন্ধ করে আশঙ্কার সময় গোনে। কি হবে, কি হবে ভয়। আর সেই রোমিও জুলিয়েটের গল্প? জুলিয়েটের ঘব থেকে রোমিও বেরিয়ে নেমে গেল ব্যলকনি বেয়ে, আর সেই সময় বুড়ি ঝি ঘরে ঢুকল। দর্শকরা তো ভয়েই অস্থির! মেঝেতে বোমিওর ড্যাগারটা পড়ে রয়েছে, এই বুঝি সব ফাঁক হয়ে গেল। তা হলেই ভাবুন, পয়সা ফেলে দিয়ে কিনা ঘটাতে পাবতেন শেক্সপিয়াব। সে জায়গায় পকেটমারদের মত ওস্তাদ আর্টিস্টরা সামান্য একটা পকেটে কাঁচি ঢুকিয়ে দেবে সে আর এমন আশ্চর্য কি।

সে কথা বললাম ভদ্রলোককে। তিনি হাসলেন।—তা-যা বলেছেন। কিন্তু এতেও হয়ত কাজ হল না। কিংবা পকেট-মারটিকে হয়ত সন্দেহ করতে শুরু করেছেন পকেটের মালিক তখন। তার জন্যেও একটা চমৎকার টেকনিক আছে পকেটমারদের। এরিয়া ভাগ আছে তাদের। যেমন ধরুন হাওড়া থেকে বালীগঞ্জ·

যাবে বাসটা। এই রুটটা চারজনের ভাগে। একজন হাওড়া থেকে শিয়ালদা অবধি যাবে, যদি ইতিমধ্যে কাজ হাঁসিল করতে না পারল তো শিয়ালদায় দলের যে লোকটি উঠল তাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে নেবে যাবে সে। তারপর দু'নম্বর লোকের এরিয়া মৌলালী পর্যন্ত, সেও যদি না পারে তো মৌলালীতে যে উঠবে তাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে নেবে যাবে সে।

বললাম, তাই নাকি!

ভদ্রলোক হাসলেন।—পকেটমারার টেকনিকও কি একটা নাকি? ধরুন আপনি ঝুলতে ঝুলতে চলেছেন, পকেটমারটি করবে কি, ডান হাতে কিছু একটা ঝুলিয়ে এমন ভাবে রড ধরবে যে আপনার ডান দিকের কানে বা চুলে লাগবে সেটা আর আপনি বিরক্ত হয়ে কেবল সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আর এই সুযোগে বাঁ হাতে পকেট সাফ করে দেবে সে।

ভদ্রলোক হঠাৎ আবার জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলেন। শিয়ালদায় বাস পৌঁছে গেছে তখন। আরেকবার সাবধান করে দিলেন, পকেট সামলে চলুন মশাই, পকেট সামলে চলুন।

হেসে বললাম, কিই বা আছে পকেটে যে সামলে চলব। কিন্তু আপনি, আপনি কি এখানেই নামবেন নাকি।

বাস থেকে নামতে নামতে ভদ্রলোক বলেন, হ্যা, আমার এরিয়া তো শেষ হয়ে গেল। বলে নেমে গেলেন তিনি। বাস ছেড়ে দিল আবার।

ও হেনরি হলে এ গল্প অবশ্য এখানে শেষ করতেন না। এবং তিনি কি ভাবে শেষ করতেন তা আমার চেয়ে কারও বেশি জানবার কথা নয়। কিন্তু ও হেনরির মত গল্প শেষ করার কৃতিত্বটা বড়, না···থাক্, সে কথা না-ই বা বললাম।

ওদের পুরুষদের নাম রাউত, মেয়েরা রয়তাইন। বহুদূর ছত্রিশগড় থেকে ওরা এসেছে জন খাটতে।

রোদে তাতানো তামাটে ওদের গায়ের রঙ। খাটো খাটো চেহারা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল পুরুষদের। মেয়েদের নিটোল পিঠে আ-নিতম্ব লম্বিত কেশের বোঝা। ভরাট গাল। ভুরুর নীচে নিখুঁত খাঁজ, প্রশান্ত চোখ, নিলাজ দৃষ্টি। সক্ষম দেহের প্রতিটি অঙ্গে পরিমিত স্বাস্থ্যের সজীবতা।

শাঁওন নদীর বাঁকে বাঁধ আর বুকে ব্রিজ তৈরীর কাজ চলছে। ওরা এসেছে জনমজুর খাটতে। রোজমাইনের লোভে অনেক পুরুষ আর অনেক অনেক মেয়ে রেজার দল। কুলিকামিন আর রেজা—রাজমজুর।

নদীর জলো বিছানা থেকে বাইশ হাত দূরে রাউতরা কাজে লেগেছে। শাবলের সঙ্গে গাঁইতির গোঙানি বাজে। মেয়েরা খিলখিল করে হাসে, ইশারা ইঙ্গিতের ঝিলিক ছড়ায়। আর অশ্লীল উক্তির প্রতিবাদে অশ্লীলতার দেমাক দেখায়। কিন্তু কাজ থামে না ওদের। বড় বড় মাটির চাঙর দরমা পিটিয়ে ভেঙ্গে ঝুড়ি বোঝাই করে দেয় বুড়োটে পুরুষদের দল। মেয়েরা ঝুড়ি কাঁধে করে দূরের কালভার্টের পাশে ফেলে আসে। রাঙা মাটির পাহাড় গড়ে ওঠে।

বুড়ো বৈজনাথ এ দলের সর্দার।

কাজ তদারক করতে করতে নিজের মেয়ের কাছে সবে এল সে। খানিক একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল শ্রমকাতরা মেয়ের দিকে।

স্নেহ উপচে পড়ল বৈজনাথের কোটরে ঢোকা চোখে। বড় বেশী ইমানদার তার মেয়ে। ডিউটির চেয়ে বেশী খাটে।—পশিনায় আস্নান করে ফেলেছিস যে শরাবী! নরম স্বরে মেয়েকে একটু জিরিয়ে নিতে বললে বৈজনাথ।

—উঁহু। মাথা ঝাঁকালে শরাবী। মুচকি হাসলে।—জোয়ানরা বললে, বেটিয়ার জন্যে দরদ লেগেছে তোমার। কথার শেষে আড়চোখে তাকিয়ে মনোহরের দিকে ইঙ্গিত করলে সে।

মাটিতে কোদালের কোপ ফেলে ফিরে তাকালে মনোহর। শরাবীর ফিকফিকে হাসি দেখে সেও হাসলে।

দ্বিতীয়বার তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই গম্ভীর হবার ভান করলে শরাবী। তারপর কি মনে হতে হঠাৎ মাথার ভরা-ঝুড়িটা উপুড় করে আছড়ে ফেলল সেখানেই। হাতে হাত ঘষে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে এগিয়ে গেল সদ্যকাটা সিমুলগাছটার কাছে। গোল ঝুড়িটা গড়িয়ে পড়েছিল মাটিতে! খাটো ময়লা শাড়ীর প্রান্তটা টেনে নামিয়ে দিয়ে গুঁড়িটার ওপর বসলে সে। হাঁটুতে কনুই রেখে হাতের চেটোয় গাল লাগিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে লাগল মনোহরের কাজ।

মনোহরের ঘামে ভেজা কপালটা চিকচিক করে। কোনদিকে খেয়াল নেই, শুধু কোপের পর কোপ বসিয়ে যায় সে মাটিতে। এক অপূর্ব ছন্দে থরথর করে কেঁপে ওঠে তার হাত, কাঁধের মাংস। বাব্‌রী চুল নেচে ওঠে, প্রবাল-রঙা কটিফল ছ'টোও। কানের ফুটোয় গোঁজা কি একটা পাথরের কুণ্ডল। কোমরে টেনেটুনে বাঁধা একখানি কাপড়। খালি গা। দেহের এপাশে ওপাশে পেশীর বক্রতা।

সিধে চোখ চালিয়েই দেখছিল শরাবী।

বাপ বৈজনাথ বারকয়েক ফিরে ফিরে তাকাল ওর দিকে।

শরাবী বুঝতে পারলে; আস্তে আস্তে উঠে এসে কাজে লাগল আবার।

আধশুকনো সবুজ পাতায় মোড়া একটা লম্বা বিড়ি টানতে টানতে জংলী এসে বসল গুঁড়িটায়।

জংলীটাকে দেখে জোয়ান মরদ বলে মনেই হয় না শরাবীর। এরই মধ্যে হাঁপাচ্ছে। অথচ মনোহর? তিনকাঠা মাটি কুপিয়েও ঘাম ঝরে না গায়ে। অথচ বয়েসে কি এমন তফাত, মোটে দু'সাল পরে জন্মেছে বৈতো নয়।

ভাবী দেওরকে ঠাট্টা করে বলেছে সে বহুবার, তুমি একটা দুব্‌লা আওরাত।

আর তুমি তেমন নও, বজরঙ্গীজীব চেলা জংলী উত্তর দেয়।

সত্যি। ক'জন মরদ খাটতে পারে শরাবীর মত। আটঘণ্টা রেজার খাটুনির পরেও আবাব দু'বেলা বাসন মাজে সে স্টেশনবাবুর বাড়ীতে। শরাবী অবশ্য সে কাজকে কাজ বলে না। বউজীর সঙ্গে গল্প করতে করতে কুয়ো থেকে দু'বালতি জল তুলতে কষ্ট হয় না তার। তারপর, কাঁসার বাসন ক'টায় হাত বুলিয়ে দেয়া।

আর বউজীও সেই ফাঁকে তরকারী কুটতে কুটতে কত নতুন খবর শোনায় তাকে। যারা মোমের পুতুল আর দো দো পয়সার জিনিস বিক্রী করে পেট চালায় তারাও নাকি রাজার জাতের সঙ্গে লড়ায়ে লেগেছে। বড় জবর লড়াই বেধেছে। স্বামীর কাছে শোনা খবরগুলো বউজী আবার জাবর কাটে।

—ওদের সঙ্গে পারছে না সাহেবরা, হেরে পালিয়ে আসছে। হাসতে হাসতে বউজী বলে।

আর শরাবী কপালে চোখ তুলে বলে, হাঁ।

কত কথাই তো শোনায় বাঙালী বউজী। শাঁওন নদীর ওপর নাকি পোল হবে, রেলের লাইন যাবে তার ওপর দিয়ে।

ইস্পাতের ওড়না ওড়াবে শাঁওন। আগরওয়ালার লাক্ষার বাগানের বাঁকটায় বানাবে য়্যানিকাট। জলের ঘূর্ণি চুইয়ে চুইয়ে বের হবে। বড় শহর বানানো হবে এখানে। জঙ্গীলাটের মহল তৈরী হবে। হাজারো সিপাই শান্ত্রী কুচকাওয়াজ করবে দিনরাত। এমনি হাজার হাজার খবর বলে যায় বাঙালী বউজী।

আর কপালে চোখ তুলে শরাবী বলে, হাঁ!

বোশেখ জষ্টি মাসে আরো কাজ বাড়ে শরাবীর। শাঁওনের পুব পাড়ে অফুরন্ত ফুলের বাগান। বালির জমিনে পা পুড়িয়ে পুড়িয়ে ত্বপুব রোদে লুকিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে সেখানে—চৌকি-দারের চোখ ফাঁকিয়ে নয়তো মিষ্ট কথায় মন ভুলিয়ে। আগর-ওয়ালার লাক্ষার চাষ, বছরে বারো লাখ টাকা মুনাফার চাষ। কুল গাছের ডালে ডালে গুটি বাঁধে। ত্ব-চারটে ডাল ভেঙে চুরি করে আনতে পারলে শনিচারীর গালার হাটে একটা টাকা বাঁধা। ধনিরামের মদের ভাঁটিতে গলা ভেজানো যাবে এক হপ্তা।

কিন্তু ওটুকু ফুর্তি আর ফুরসতের পাশে অন্য কাজ থাকে শরাবীব। বাপকে ত্ব'বেলা রেঁধে খাওয়াতে হয় তাকে, অরহরের ডাল আর রুটি। ভাজি তরকারি ত্ব'একটা পপিনা নয়তো পুদিনার। হাতে পয়সা জমলে বেসন আর পেঁয়াজ নিয়ে আসে, সেট আর পকৌড়ি ভাজে, দহিবড়া আর গোলগাপ্পা। চৌমাথার গুজরাটির দোকান থেকে কিনে আনে গরম জিলাপী। স্টেশনবাবুর বাড়ী থেকে চেয়ে-আনা টমাটোর চাটনি বানিয়ে বাপকে বলে, জল্‌দি ফিরে এসো, আজ বিলাইতির চাটনি বানিয়েছি।

বাপ বৈজনাথের জোয়ান বয়েস ছিল, বুঝতে ব্যাঘাত হয় না তার। ফিরবার সময় তাই মনোহরকে সঙ্গে আনে।

ত্ব'জনে খেতে বসে পাশাপাশি। চিবিয়ে চিবিয়ে নিজের ছোটবেলাকার কাহিনী শোনায় বৈজনাথ। মাঝে মাঝে মেয়ের

রান্নার প্রশংসা করে। বলে, বেটিয়া আমার ঠিক ওর মায়ের মত হয়েছে, বুঝলে জামাই।

বিয়ে এখনো হয়নি, তবু মনোহরকে জামাই বলেই ডাকে সে।

জবাব দেয় না মনোহর! নেশায় মাতাল হয়ে না থাকলে ভাবী শ্বশুরের কাছে লজ্জা কাটে না তার। তাই নিঃশব্দে মাথা হেঁট করে আহারে মন দেয়। চোখ তুলতে পারে না।

শরাবী কিন্তু শরমে মরে যাবার মত মেয়ে নয়। সামনে দাঁড়িয়ে ফিকফিক করে হাসে সে। সম্পূর্ণ চোখে মনোহরকে দেখে। আর খুশিয়ালী দিন কেটে চলে ওদের। সর্পিল শাঁওনের বুক চুয়ে চুয়ে রাশি রাশি জল চলে নেমে যায় নীচের সমুদ্রে।

শাঁওন নদীর তীরে রাউত নাচ শুরু হয়েছে। এমন ওদের প্রায়ই হয়।

নীলাভ রাত। আকাশে তারার জনতা। মহুয়া মদের ফেনার মত সাদা মেঘ কেটে কেটে এগিয়ে চলে চাঁদের চাকা। খুশে ঢুলছে সারা দুনিয়া। বোরখা পরা দৈত্যের মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে দূর বৃক্ষবনানীর আবছা ছায়া।

বিরতিবিহীন শাঁওন নদীর জল গড়িয়ে চলেছে। জ্যোছনায় চিকমিক করে শিশুতরঙ্গের সারি। দূর থেকে দেখায় যেন রূপালী পাতের মত। ভাঙা বিদ্যুতের মত। মন্দস্রোতা শাঁওননদীর কুলকুল শোনা যায়! নুড়ির ঘষানি খাওয়া জলতরঙ্গের মিহি আওয়াজ আসে। ধীর বাতাসের শিস বাজে কাঁকুই-ফাটা খেজুর পাতার শিরে। মৃদুমন্থর বাতাস লেগে খেজুরের পাতা দুলে ওঠে।

গায়ে গা লাগিয়ে একসারি হোগলার ছাউনি পড়ে আছে রাতের আঁধারে। অনেক দূরের দেহাতগাঁও থেকে ব্রিজ তৈরীর কাজে জনমজুর খাটতে এসেছে রাউত রয়তাইনের দল। শাঁওনের

বালির বালিয়াড়িতে ক্ষণবাসের উপযোগী ছোট ছোট বাসা বেঁধেছে ওরা। হোগলার ছাউনি। তিমির মত ছায়া-ছায়া পিঠ ভাসিয়ে পড়ে আছে ঘেসো তাঁবুর শ্রেণী। ছোট ছোট কেরোসিনের ডিবরি ক্ষীণ আলোর রোশনাই ছুঁড়ছে। অনেক দূর থেকে, শাঁওনের ওপাড় থেকে দেখলে মনে হবে নোঙর ফেলা নৌকার শ্রেণী। ফিতে কমিয়ে দেয়া হারিকেন লণ্ঠন ঝুলছে ঠেকার বাঁশ থেকে। আর নয় তো ডিবরি। আগুনের আলো নেই সেখানে, শুধু রূপোর পাহাড় থেকে ছিটকে পড়া নীলাভ জ্যোছনা।

কিন্তু ময়দানের জলসায় অনেক আলো আর অনেক আগুন, শুকনো পাতা আর খড়কুটোর আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে। ধোঁয়ার ফানুস দুলে দুলে উঠছে আকাশ পানে। মজলিস মজিয়ে তুলছে চারপাশের রাউত রয়তাইনের দল।

জংলী বাঁশী বাজাচ্ছে।

বাঁশের বাঁশীর সুর উঠছে কেঁপে কেঁপে। কড়ি ও কোমল সুর মিলিয়ে মাঝে মাঝে বেজে উঠছে উন্মত্ত ঢোলকের আওয়াজ। উদ্দাম গানের গোঙানি থমকে উঠছে থেকে থেকে। নাচের ঘূর্ণি চলেছে। নাচের তালে তালে হাতের তালি বাজিয়ে নেচে চলেছে রয়তাইনের দল তুফানের মত। গান গাইতে গাইতে কোমর নুইয়ে নেচে নেচে ঘুরপাক দিচ্ছে, পায়ের তাল মিলিয়ে হাতের তালি তাতিয়ে তুলছে। নাচের ঘূর্ণিতে বেহুঁশ হয়ে গেছে ওরা। সমস্ত দেহমনসত্তা যেন চূর্ণ চূর্ণ হয়ে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে ফুলের রেণুর মত। বাঁশীর সুর ককিয়ে উঠছে। আগুনের কুণ্ডটা নাচতে নাচতে পাক দিচ্ছে ওরা। আর পুরুষের দল দূরে বসে বাঁশী আর ঢোলক বাজিয়ে চলেছে। আর খঞ্জনি।

বাঁশী বাজিয়ে চলেছে ওরা। মাঝে মাঝে মেয়েদের দিকে চোখ ছুঁড়ে চোখ ফিরে পেয়ে হেসে উঠছে। মেয়েরাও বিদ্রূপের

হাসির হিল্লোল ছিটিয়ে দিচ্ছে। বুড়ো জোয়ান আর বাচ্চার দল সবাই নেশায় তলিয়ে গেছে। মগজের তন্ত্রী অবশ হয়ে গেছে মহুয়ার মদে। দিলখুশ হয়ে খুশিয়ালীর স্বপ্ন বুনছে। রসাতুর চোখ আসছে ঝিমিয়ে।

মনোহর আর শবাবী চোখ চাওয়াচাওয়ি করে। মনোহরের মুখে লোভী হাসি দেখে ঠোঁটেব কোণে ফিক করে হেসে ফেলে শরাবী। চকিত চোখ সরিয়ে নাচতে শুরু করে দলের সঙ্গে।

রাত বেড়ে আসে ক্রমে। ক্রমে তামাম জলসা থেমে থিতিয়ে যায়।

শ্রীরামজী আর সীতামায়ের আশীর্বাদ মেগে বুড়ো বৈজনাথ দলের কাছ থেকে শরারীর বিয়ের হুকুম চায়। সাতদিন পরেই বিয়ে দেবে সে শরাবীর মনোহরের সঙ্গে। সোল্লাসে সবাই মত দেয়। কিন্তু ভোজ দিতে হবে দলকে। বৈজনাথ বিশ টাকা, মনোহর বিশ টাকা।

বৈজনাথ তাতেই রাজী। মনোহর কিন্তু অত পাববে না। এমনিই বেচারার অনেক খরচ। কিনতে অবশ্য হয়নি, তবু যা রীতি তা তো করত হবে। দশ পাঁচ টাকা বধুব বাপকে তো ধবে দিতেই হবে। আজ নয় দূর দেশে রোজকাব করতে এসেছে তারা। জন্মেছে তো সেই বিলাসপুর ছত্রিশগড়ের মাটিতে। পণের টাকা না দিয়ে মেয়ে নেবে কি করে সে। তারপর শরাবীকেও চাঁদির হাঁসুলি গড়িয়ে দিতে হবেই।

অনেক ধরাধরি করে ভোজের অঙ্কটা পনেরোয় নামায় মনোহর।

একে একে হোগলার ছাউনির দিকে পা বাড়ায় সবাই। রাত অনেক হয়েছে, কাল আবার ডিউটি দিতে হবে।

ফিরবার পথে বুড়ো বৈজনাথ হঠাৎ মনোহরের হাতটা খপ্ করে ধরে। বলে, একটু ভালভাবে রেখো শরাবীকে। ও বড্ড

ভাল মেয়ে। বুড়ো বৈজনাথের সজল চোখজোড়া চকমক করে। ধরা গলায় হাসবার চেষ্টা করে বলে, বেটিয়া আমার ঠিক ওর মায়ের মত, বুঝলে দামাদ।

ছাউনিতে ফিবে দড়িব খাটিয়ায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল বৈজনাথ। অনেক ধকল গেছে শুকনো হাড়েব ওপব দিয়ে। আজ অনেকটা তৃপ্তিব ঝোঁকেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল সে।

শবাবীব চোখে তখনও ঘুম নামে নি। মনোহবেব কথা ভাবছিল সে। আগামী ঐশ্বর্যেব স্বপ্ন দেখছিল। শুয়ে শুয়ে ভবিষ্যৎ দিনেব অনেক বঙিন ইন্দ্রধনুব গায়ে কল্পনাব তুলি বুলিয়ে চলে। উদ্দাম সুখাতিশয্যে গড়া একটি চলমান নীড়। উন্মদ আনন্দের পান্থশালা।

হঠাৎ শবাবীব মনে হল বাইবে কে যেন ঘুবে বেড়াচ্ছে। শুকনো পাতার ওপব পা মাড়ানোব মবমব ধ্বনি শুনতে পেল সে। বুড়ো বাপেব নিদ্রিত মুখটার দিকে চকিতে ক'বার তাকিয়ে নিয়ে পা টিপে টিপে হোগলাব মুখে এসে দাঁড়ালে শরাবী। তাবপব বাইবে চমক মেরে দেখলে, ছায়াশরীর কে একজন খানিক দূবে পাযচাবি কবছে অবিবত। চিনতে পারলে সে। মন অধীব হয়ে উঠল, সবুর সইতে বাজি নয সে।

ধীবে ধীবে বাইবে বেবিয়ে এল। একটা বিশাল খণ্ডমেঘের কালিমায চাঁদেব মুখ ঢেকে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে ভরসায় ভর দিয়ে এগিয়ে এল সে।

পাতা মাড়ানোব আওয়াজ শুনে চমকে ফিরে তাকালে মনোহর।—শবাবী?

শরাবীর বিয়েব পবেও সর্পিল শাঁওনেব বুক চুঁয়ে চুঁয়ে রাশি রাশি জল চলে নেমে গেছে নীচের সমুদ্রে। আকাশে অনেক

তারা ফেটেছে ফুটেছে, মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে। বাতাস বদলে গেছে বাবুলডিহির। হ্যাঁ, বাবুলডিহির বাতাস তেতে উঠেছে হাজারো ফৌজের সিগারেটের ধোঁয়ায়।

শাঁওনের এপাড়ে বালির বালাপোশ পেরিয়ে সবুজ ঘাসের জমিতে বসেছে এক ঝাঁক সাদা ধবধবে কবুতর। কবুতর নয়, সাদা টারপলিনের তাঁবু পড়েছে সারি সারি। যেন ভোরপাখীদের ধ-পালক ঝলমল করে ওঠে সোনালী সকালের রোদ্দুর লেগে। হঠাৎ একদিন বাবুলডিহির লোকে দেখলে কালভার্টের কোল ঘেঁষে তাঁবু পড়েছে সারি সারি

কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা কংক্রিটের বাংলে উঠল। কাঠের স্ট্যাণ্ডেতে উঁচু মাঝাবি আর নীচু দরের নিশানা সেঁটে বাবুলডিহি জাঁকিয়ে বসলো হাজার হাজার সেপাই শান্ত্রীর দল।

গেঁয়ো মুর্গীর মড়ক পড়ে গেল সিপাহীদের পাকশালায়। ডিম মাছ তরকারি হাটে হোঁচট খাবারও সময় পেল না। মুলুকে মুড়ি মুড়কি মেলবারও জো রইল না। আদার ব্যাপারিও জাহাজে আগুন লাগার খোঁজ রাখতে শুরু করলে। টাকার থলি উঠল বেলুনের মত ফেঁপে। গরীব হাটিয়াদের জালের গেঁজে ভরে উঠল টাকায় টাকায়।

ফৌজী সিপাহীদের শুভাশুভের জন্যে দু'হাত তুলে ওরা প্রার্থনা করলে ভগবানের কাছে। দেশছাড়া গোরাপল্টনদের কথা ভেবে সহানুভূতির আবেগ জাগল ওদের সজল চোখে। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের পরীর দেশ থেকে স্বর্গের অপ্সরীর মত সুন্দরী মেয়েদের মায়া কাটিয়ে বাবুলডিহির গরীব কিষাণদের বারাত ফিরিয়ে দিতে এসেছে ওরা।

কিন্তু রাউত রয়তাইনদের সুখের দিন শেষ হয়ে এল ক্রমশ।

ব্রিজ তৈরীর প্রথম অধ্যায় শেষ হয়ে গেলে কুলিকামিন

আর রেজা-রোজমজুরদের নাম ছাঁটাইয়ে পড়ল হাজরির খাতা থেকে। ওদের আয়ের স্রোতে ছেদ পড়ল।

হোগলার ছাউনি তুললে না তবু। কোথায় আর যাবে। লাঠির ডগায় সংসার বেঁধে ক্যাঙ্গারুর মত কুঁজিয়ে কুঁজিয়ে হেঁটে বেড়ালো দিন কয়েক। কাজের আশায়। কারো জুটল কাজ, কারো বা জুটল না।

মনোহব নিকাজ। তাই স্টেশনবাবুব বাড়ী ছাড়াও আর এক বাড়ীতে বাসন মাজাব কাজ নিল শবাবী।

শরাবী সুখী হল। তাব নিজেব আয়ে স্বামীকে বসিযে খাওয়ানোব মধ্যে অদ্ভুত একটা আনন্দ আছে। নবম মাটির মেয়ে নয় সে। ছত্রিশগড়েব পাথুবে মাটিব মতই শক্ত তার কলজে। উপার্জনেব গৌবব নেবে সে।

মনোহব চেষ্টা ছাড়লে না। তা বলে লজ্জাও পেল না সে। এমন তো তাদেব হামেশাই হয়। কাজ জুটলে মেয়ে পুরুষ দু'জনেই খাটে। বাজাব মন্দা হলে একজনেব আয়ে আর একজন বসে খায়। স্বামীব উপার্জনে যখন স্ত্রী বসে খায় তখন তো তাব লজ্জা হয় না! স্ত্রীব উপার্জনের অংশ গ্রহণ করতে স্বামীর মাথাই বা নীচু হবে কেন? স্বেচ্ছায় তো অকর্মণ্যের মত বসে নেই সে।

বন্ধুদেব সঙ্গে তেতাস খেলাব জন্য নগদ চাব আনা পয়সা মরোহরেব হাতে গুঁজে দিয়ে শরাবী বেরিয়ে পড়ল। দু'বাড়ীতে বাসন মাজতে হবে। জিবিয়ে বসে কাজ করা চলে না। সকালে প্রথম গাড়ী আসার আগে কাজ সেবে না দিলে বকুনি খেতে হয়। বউজী অবশ্য দু'একখানা বাসন নিজেই মেজে নেয়, যেদিন শবাবীর দেবি হয় যেতে। কিন্তু দেবি করতে ইচ্ছে হয় না তাব। বাঙালী বউজীর ঐ ননীব মত নরম হাতে বাসন মাজতে কি কষ্ট হয়। শরাবীর দরদী মন বউজীর কাল্পনিক দুঃখের কথা

ভেবে কষ্ট পায়। আহা কত দূর দেশ থেকে এসেছে মা বাপ ছেড়ে।

দূর প্রবাসী বাঙালী বধূটির কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল সে। তাঁবুগুলোর পাশ কাটিয়ে খানিক দূর দিয়েই হাঁটছিল। হঠাৎ তন্ময়তা ভেঙ্গে গেল। কৌতুকের হাসি ফুলে উঠল তার ঠোঁটে আপনা থেকেই। শেষ তাঁবুটা থেকে খানিক দূরের আমলকী গাছটায় ঠেস দিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে লোকটা তারই অপেক্ষায়। শরাবী জানে তাকে দেখবার জন্যেই সাহেব দাঁড়িয়ে থাকে ওখানে। চোখে-চোখে একটা রসিকতা করে শরাবী। সাহেব দেখে আর হাসে। মায়া হয়। সাহেব মানুষ, রোদে পুড়ে লালচে হয়ে আছে মুখটা। সাহস পেয়ে সাহেব ইশারা করে ডাক দেয়। শিস্ দিয়ে ডাক দেয়। শরাবী এবার ভয় পেয়ে যায়। তর তর করে এক রকম ছুটে পালিয়ে আসে। স্টেশনবাবুর খিড়কির শেকল নেড়ে হাঁফ ছাড়ে। তবু নেশা কাটাতে পারেনা। রোজই রসিকতা করে, রোজ পালিয়ে আসে ভয়ে। ডাঙ্গায় তোলার ইচ্ছা নেই তার মনে। খেলিয়ে মাছকে জলে ছেড়ে দেবার আনন্দটুকু ছাড়তে পারে না সে। তাই ব্যবধান রেখে চলে।

সেদিনও ছুটতে ছুটতে এসে কপাটে ধাক্কা দিলে সে।

বউজী কপাট খুলেই এক গাল হেসে বললে, আমার মেঠাই?

শরাবীর মনে পড়ে গেল। বিয়ের পর থেকে বউজী রোজই মিঠাই চেয়ে আসছে তার কাছে। অথচ বেচারার যখন হাতে পয়সা থাকে তখন মনে থাকে না, যখন মনে পরে তখন হাতে পয়সা থাকে না। ভদ্রঘরের বাঙালী বৌকে তো আর সস্তা মিঠাই মণ্ডা দেয়া যায় না।

শরাবী প্রতিদিনের মত আশ্বাস দিলে, কাল জরুর আনব বহুজী।

কপট ক্রোধে মায়া বললে কাল যদি না পাই তো তোর সঙ্গে কথা বন্ধ।

মায়ার ভঙ্গী দেখে শরাবী হেসে ফেললে।

মায়া বললে, কাল মিঠাই আনবি, আর তোর বরকে সঙ্গে আনিস।

ওদের হু'জনের জন্যে যে উপহারের ব্যবস্থা করে রেখেছে তা আর জানাল না শরাবীকে।

শরাবীই বললে, মিঠাই তো খাওয়াব, আমার বিয়েতে কিছু তো দিলে না বহুজী।

মায়া চটে উঠল।—হ্যাঁ, লুকিয়ে বিয়ে করে এক মাস পরে জানাবি, আর তোকে আমি শাড়ী দোব!

শরাবী হাসতে হাসতে বাসন কোসন টেনে নেয়। হাত কামাই না দিয়ে বলে, ও আসতে চায় না, শরম লাগে ওর।

ক্রমশ গল্প জমে ওঠে। দেশ বিদেশের গল্প শুনতে থাকে শরাবী। যুদ্ধের খবর, গান্ধী মহারাজের খবর, বাবুলডিহির খবর।

হঠাৎ একটা খবর শুনে আমলকী তলার সাহেবটার ওপর চটে উঠে সে।

কে এক ভদ্রলোক তার বউকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল সন্ধ্যার দিকে। এমন সময় একজন গোরাপল্টন বউটির কাপড় ধরে টান দেয়। মেয়েটির চিৎকার শুনে লোকজন এসে বাঁচায়।

শুনতে শুনতে রগের শিরাটা দপ করে উঠল শরাবীর। দাঁতে দাঁত চেপে বললে,—হারামী।

বিমর্ষ হাসি হাসলে মায়া। বললে, বদমাশ লোক তো হুনিয়ার সব জায়গাতেই আছে, বদমাশি বন্ধ করবে কি করে।

—চাবুকের চোটে তুষমনকে দেওতা বানানো যায় বহুজী। আমি হলে বদলি না নিয়ে ছাড়তাম না।

—শয়তানের সঙ্গে পারবি কেন। হাসলে মায়া।

শরাবী নিজের মনেই বললে, হিন্দুস্থানের জেনানাদের চেনে না।

সেদিন বাসায় ফিরবার পথে ভুলেও একবার তাকালে না সে আমলকী গাছটার দিকে। খাকী কোর্তাপরা সাহেব কাপ্তেনী টুপির নীচে বিস্ফুরিত চোখ মেলে তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে। তার মুখেব সিগারেটেব আগুনটাও যেন মিইয়ে গেছে।

শক্ত সমর্থ চেহারা শরাবীব। ভীরু মেয়ে নয় সে। ওব চোখের দৃষ্টি দেখে ভয় পায় এমন মানুষের অভাব নেই। দৃপ্ত ভঙ্গীতে হেঁটে বেড়ায় হাটে বাজাবে। তেজীয়ান। এতটুকু ভয় নেই, ডর নেই।

কিন্তু এইটাই শরাবীর একমাত্র পবিচয় নয়। ওবও হাতেব কাঁকনে কাঁপন বাজে। ওবও চতুব চোখ চটুল হযে ওঠে মাঝে মাঝে! জ্যোছনা বাতের অধীবতায় তুলে তুলে ওঠে ওব বুক। মায়া, মমতা, ভালবাসা। মত্ততাব মাধুর্য। নাবীত্বেব সম্পূর্ণতা থেকে এক রত্তিও নীচে নয় সে।

তাই ঠিক মেয়েদের মতই ভালবাসতে পারে সে। মনোহরকে স্বামীর চেয়েও বেশী ভালবাসে সে। অর্থাৎ মনোহব স্বামী না হয়ে অন্য কারো সঙ্গে যদি বিয়ে হত তার, তবে যেটুকু ভালবাসা দিতে পারত সে, তার চেয়ে বেশী—অনেক বেশী ভালবাসে সে মনোহরকে।

মনোহরও তার অজস্র ভালবাসা দিয়ে সুখী করতে চায় শরাবীকে। সমস্ত তুপুবটা কাজেব চেষ্টায় ধুলো উড়িয়ে উড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় সে। সকাল সন্ধ্যায় নানা ভাবে শরাবীকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে।

দলের লোকের কাছে অজ্ঞাত নয় ওদেব আন্তবিক সম্বন্ধ মেয়েরা ঈর্ষা কবে। পুরুষবা মনোহবকে বলে ভেড়ুয়া। মনোহব শোনে আব হাসে। জানে ভেড়ুয়া হয়েও যদি সুখ পাওযা যায, সেটাই বা মন্দ কি।

শবাবী কিন্তু দলেব মেয়েদেব সহ্য কবতে পাবে না। ওদেব ঈর্ষাটা যেন ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে।

দুপুবে কাজ থাকে না। তাই বসে বসে বয়তাইনেব দল জটলা পাকাচ্ছিল। চুপ কবে একা একা সময কাটানো যায না। তাই শবাবীও এল সেখানে।

বছবখানেক হল গোরা পল্টনবা এসেছে। ঐ পল্টনদের নিযেই গল্প হচ্ছিল তাদেব। এমন সময কাঞ্চী এসে হাজিব হল। কোলে ছেলে নিয়ে।

পল্টনবা আসাব পব থেকে বাউতদেব কাজ গেছে। অবস্থাও সকলেব খাবাপ। কিন্তু কাঞ্চীব এখন বৃহস্পতিব দশা। বুদ্ধি খেলিযে কাজ জুটিযে নিযেছিল সে। ঝুড়ি হাতে কবে কাছের দেহাত গাঁযে ঘুবে বেড়াত, আব বাড়ী বাড়ী ঘুবে ডিম কিনে এনে বিক্রি কবত পল্টনদেব ক্যাম্পে। দুপুবে বযতাইনদেব আড্ডায় পাত্তা মিলত না তাব কোনদিন। সবাই জানত টাকাব গাছ পুঁতেছে ওবা। নতুন নতুন শাড়ী, বঙিন কাঁচেব জলচুড়ি, চাঁদির বাজু পবত কাঞ্চী। দেমাকে মাটিতে পা পড়ত না।

আজ ওবা সকলে দেখলে কাঞ্চী ঠিক ওদেবই মত। কোলের ছোট্ট ছেলেটাকে দেখে শবাবী বুঝে নিলে ব্যাপার। এত দিন আতুবে পড়ে ছিল বেচাবী। হাতেব টাকাও হয় তো ফুরিয়েছে। তাই আবাব যে বয়তাইন সেই বয়তাইন হয়ে গেছে কাঞ্চী।

কিন্তু ছেলেব গববে কাঞ্চীব মুখে যেন আব হাসি আঁটে না। সকলকে তুলে তুলে ছেলে দেখালে সে। সত্যিই চমৎকাব ছেলে।

নধর দেহ। বড় বড় শান্ত চোখ। স্পঞ্জের মত তুলতুলে নরম তার হাত পা। সকলেই ওকে কোলে নেবার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠল। শরাবীও হাত বাড়ালে।

শরাবীর কোলে ছেলে দিয়ে কাঞ্চী কি যেন বললে। হাসির হিল্লোল তুললে সবাই। কথাটা শুনে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হল শরাবীর। মনে মনে রাগে জ্বলে উঠল ওর সারা শরীর। তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে কিছু একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করলে।

সত্যি। এতদিন কেটে গেছে বিয়ের পর। এখনও সন্তান-সম্ভবা হল না সে। ওর স্বপ্নশিশুর কোন সূচনাই দেখা দিচ্ছে না এখনও। কিন্তু দলের মেয়েদের, বিশেষ করে কাঞ্চীকে ক্ষমা করতে পারলে না সে। মনোহরকে কেউ এত ছোট করতে পারে ভাবতেও পাবে না সে। ছেলেমেয়ে কি মানুষের ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করে। দেওতা না দিলে, শ্রীরামজীব দয়া না হলে সে কি করতে পারে? মনোহরই বা কি করতে পাবে?

সেও নিশ্চয় মা হবে একদিন। এমন কিছু সময় বয়ে যায়নি। আর কাঞ্চীরই বা এত গর্ব কিসেব, হয়েছে তো একটা ছেলে। হোক্ সুন্দর। বিয়ের সময় দেখবে কত টাকা লাগে বউ কিনতে। ছেলে চায় না শরাবী। একটা ফুটফুটে মেয়ে হবে তাব। স্বয়ং ভগবানের দেওয়া সন্তান। টানাটানা চোখ আর সমুদ্রের ফেনার মত ফর্সা ধবধবে তার গায়ের রঙ। জান্‌কী দেবীব মত সুন্দর।

ডেরায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে শরাবী।

চকিতে ছায়াছবির মত একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে।—ফেন্‌সিংয়ের তারে বসে বসে সিগারেট টানছে গোরা সাহেব।

না, গুণে গুণে পাঁচ কুড়ি টাকা না নিয়ে বিয়ে দেবে না সে মেয়ের। রাউতদের সব থেকে সেরা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে।

কিন্তু।

সন্তান লাভ সে তো নির্ভর করে দেওতার সন্তুষ্টির ওপর। শ্রীরামজীর কাছে দু'বেলা প্রার্থনা জানায় শরাবী।

—তোমার বাচ্চা দু'টো বহুত খুবসুরত বহুজী। মায়াকে বলে।

শরাবী মাথা নীচু করে কাজ করে যায়।

বউজীর দেওয়া তাবিজ পরেও কিছু ফল হয় না। ক্রমশ অসুখী হয়ে ওঠে শরাবী। বউজীর দয়ায় বরাত খুলে গেছে তাদের। কিন্তু স্বপ্ন সফল হয়নি।

লাল সবুজ ঝাণ্ডা দেখাবার কাজ মিলেছে মনোহরের। কবুতর খোপের মত একটা রেলের কোয়ার্টার পেয়েছে সে। লাল কোর্তা পরা স্টেশনের কুলী হয়েছে জংলী। সবই বউজীর দয়ায়।

বুড়ো বৈজনাথও কোথায় যেন কাজ জুটিয়েছিল, নিতে দেয়নি শরাবী। বুড়ো বাপকে দু'বেলা খেতে দিতে সে পারবে। কিন্তু বহুজীর দেয়া মাদুলিটায় যদি কাজ হত। শরাবী ভাবে, বহুজীকে বলবে আর একটা আনিয়ে দিতে। এটার বোধ হয় জোর কমে গেছে। সময় পেলেই একবার ছত্রিশগড় থেকে ঘুরেও আসবে। শিউজীর মন্দিরে তিনদিন না খেয়ে পড়ে থাকলে নাকি প্রার্থনা সফল হয়।

পাঁচ রকম আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে আগরওয়ালার লাক্ষার বাগান থেকে ফিরছিল সে।

তাঁবুর সারিটা পার হয়ে এল।

হঠাৎ কি খেয়াল হতে ফিরে তাকালে সে। শেষ তাঁবুটা থেকে খানিক দূরের অর্জুন গাছটায় ঠেস দিয়ে কি একটা বই পড়ছে গোরা সাহেব। ঠোঁটে একটা ধূমায়মান সিগারেট চেপে বই পড়ছে তন্ময় হয়ে।

জোর করে কাশলে শরাবী। চমকে চোখ তুললে গোরা সাহেব। শরাবীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাসলে সে। আজ আর ভয় পেল না শরাবী। মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে শুরু করলে।

টিপটিপে ঠোঁটের কোণে কৌতুকী হাসিটা হঠাৎ চমকে চুপ করল। শিশু-সন্ধ্যার গালে চাবুকের মত ফেটে পড়ল একটা তীব্র শিস। শরাবী শুনতে পেল। বুকটা দুলে উঠল একবার আশঙ্কায়। ফিরে তাকাতে সাহস হল না।

বুটপরা ভারি-পায়ের পদধ্বনি এগিয়ে আসছে অনুভব করলে।

ছত্রিশগড়ের মাটি মনোহরের মন টানল।

দশহরার ছুটিতে যাত্রা করলে দু'জনে।

রেললাইনের দু'পাশে ভুট্টা আর জনারের ক্ষেত। লাল মাঠ আর কালো কালো পাহাড় পিছনে ফেলে ছুটে চলেছে ট্রেনখানা। পাশাপাশি বসে আছে মনোহর। গাড়ীর ঝাঁকানিতে দেহে দেহ ঠেকছে ক্ষণে ক্ষণে। এমন দিনের কত সুখস্বপ্নই না বুনেছে সে একদিন। কত নির্জন দুপুর শুধু এইটুকু তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে রসাতুর হয়ে উঠেছে। অথচ আজ দু'পাশের দীপ্তি দেখে আনন্দ পায় না শরাবী।

ছত্রিশগড় পৌঁছে দু'টো দিন কেটে গেল তার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে।

তৃতীয় দিন থেকে ধর্ণা দিল সে শিউজীর মন্দিরে।

পর-পর তিনদিন পড়ে রইল পাথরের সিঁড়িতে উপবাসক্ষীণ দেহে। শেষ রাত্রেও দেবতার আশীর্বাদ শুনতে পেল না। দেখতে পেল না কোন স্বপ্ন।

ব্যর্থ মনে বাবুলডিহিতে ফিরে এল সে

আবার সেই দিনানুদৈনিক কাজের চরকায় ঘুরতে শুরু করলে।

বুড়ো বৈজনাথ অশ্বাস দিলে। দেবতা যখন আশীর্বাদ দেন, মনে মনেই দেন। চিৎকার করে কিছু বলেন না।

শরাবী ভাবলে হয়ত বা তাই।

দিনের পর দিন কেটে চলে। হঠাৎ শরাবী টের পায়, ভগবানের দয়া হয়েছে। স্বপ্ন সফল হতে চলেছে তার। মাতৃত্বের সূচনা দেখা দিয়েছে। গর্বে বুক কেঁপে উঠল তার। সুন্দর সন্তানের মা হবে সে। অদ্ভুত সুন্দর হবে তার ছেলে, অনুভবে বুঝতে পারে শরাবী।

রোজ-রাঙা একটি মুখের স্মৃতি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। রঙিন রামধনুব দিকে চোখ চেয়ে যার সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে এসেছে সে। কোথায় যেন চলে গেছে সে। কোন নতুন ডেরায় শবাবী-স্মৃতিবিজড়িত মনে না-নিদ্ চোখ চেয়ে বসে আছে হয়ত। ভাবতে থাকে শরাবী। সুন্দবের কথা ভাবতে ভাবতে নিজেও সুন্দর হয়ে ওঠে

সত্যি মাতৃত্ব এত সৌন্দর্য আনে দেহে। এ সরল সৌন্দর্যের বহ্নিবিলাস নয়। অবসাদী পরিপূর্ণতা। কুমারসম্ভবা শরাবীর দেহে এসেছে উল্লাস। প্রাচুর্যে রেখায়িত হয়ে উঠছে। চিকন চক্ষে নেমেছে মাধুর্য।

সর্পিল শাঁওনের বুক চুঁয়ে চুঁয়ে রাশি রাশি জল চলে নেমে গেছে নীচের সমুদ্রে। আকাশে অনেক মেঘ মেতেছে মজেছে মিলিয়ে গেছে। বাতাস বদলে গেছে বাবুলডিহির। না, বাবুল-ডিহির বাতাসে আর সিগারেটের ধোঁয়ার চক্র ওঠে না। গোরা-পল্টনের দল ক্ষণবাসের প্রাসাদ মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে চলে গেছে কোন সুদূরের নতুন ডেরায়।

একটু একটু করে জ্ঞান ফিরে আসছিল শরাবীর।

স্টেশনমাস্টার মাঝরাতে খবর পাঠিয়েছিলেন রেলের ডাক্তারকে। এতক্ষণে এলেন তিনি। পথে আরো দু'চারটে রুগী দেখতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে তাঁর।

প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে হঠাৎ নবজাত শিশুটির দিকে চোখ গেল তাঁর। ভয়ে শিউরে উঠলেন। জীবনে অনেক দেখেছেন, দেখেছেন অনেক রুগী।

কিন্তু।

—অল্ রোডস লীড টু রোম। নিজের মনে বললেন ডাক্তার বোস

রবারের দস্তানা পরে উল্টেপাল্টে দেখলেন ছেলেটাকে। হ্যাঁ, পিঠের দাগগুলোও তারপর পরীক্ষা করলেন শরাবীকে।

এটা নিয়ে তিনটে।

শরাবীর দেহ থেকে খানিকটা রক্ত নিয়ে ভরলেন টিউবে।

তারপর ভিজিটের টাকা নিয়ে বাইক ঠেলতে ঠেলতে বাসার পথ ধরলেন।

ডিসট্যান্ট সিগন্যালের লাল আলোটা থমকে নিভে গেল। ভোর হয়েছে যে। দূরের মহুয়া বনের ওপাড়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সূর্য উঠছে। গলানো কাচের মত একমুঠো হলহলে রক্ত। সূর্য উঠছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আকাশের কোল ঘেঁষে। আমলকীর কচি পাতায় ভোরের আলো লেগে চিকচিক করছে। মৃদু বাতাসের ঘা খেয়ে দুলে দুলে উঠছে থেকে থেকে। ভোর হচ্ছে। ভূমিকা শুরু হয়েছে দিবারাত্রির ইতিহাসের। ইতিহাসের আরম্ভ।

বাইক ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে চলেন ডাক্তার বোস। কল্পনার চোখে উল্টে চলেন আগামী দিনের ইতিহাসের পাতাগুলো।

পাঁচ দশ পঞ্চাশ বছর পরে। শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পৃথিবীর বুকেও নেমে আসবে যুগাভিশাপ। গরলাক্ত শোণিতাঙ্কুরের অভিশাপ বিস্তৃত হবে দেশে দেশান্তরে, আকাশে বাতাসে নির্বীর্য মানুষের কুটিল ক্রন্দন ভেসে বেড়াবে। ভবিষ্যতের সরল নির্দোষ নিরপরাধ মানুষ ভোগ করে যাবে কুটান্তর রুধিরের উত্তরাধিকার

ঘুম

হিরণ সরকারের বিয়ে।

সেই হিরণ সরকার—যাকে কেন্দ্র করে দু'দিন আগেও কাকলী ফুটত কাঁকনের কোলে। মেয়েদেব মজলিসে জাল আর জল্পনার সৃষ্টি হত। কত অভিনয় আর আব্দার, কত ব্যঙ্গ আর বৈচিত্র্য, কত রঙ্গ আর রসিকতা।

বরফের মত মসৃণ মাদকতা ছিল ভাব দেহে, সে কথা সত্যি। হয়ত বা একটু মেয়েলী মাধুর্য। অথচ, চিন্তার মত চঞ্চল। চোখের ওপর পুরু লেন্সের চশমা, নাকের নীচে নীলাভ দ্বিতীয় বঙ্কনী। অর্থাৎ, সবে মিলে ও হল চমৎকার সুন্দর। কিন্তু। হ্যাঁ, ওর সৌন্দর্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলতা এনেছে ওর পকেটের মাদুর-কাঠির বোনা মুদ্রাধার। অর্থাৎ, হিবণ সরকাবেব চেহাবাব চমৎকারিত্বের চেয়ে ওর পার্সের পশাব অনেক বেশী। ও হল বিখ্যাত বাণিজ্য চুম্বক সূর্যেন সরকারের উত্তরাধিকারী। সূর্যেন সরকারের একমাত্র পুত্র হিরণ।

একমাত্র সন্তান নয়। হিরণের চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট একটি মেয়ে রেখে গেছেন সূর্যেন্দুবিকাশ। সূর্যেন্দুবিকাশের জীবিতকালেই তাঁর স্ত্রী মারা যান, তাই প্রাক্ম্যাচিওরিটির সময় থেকেই হিরণ আর বন্দনা স্বাধীন ভাবে মানুষ হয়ে উঠেছে। স্ত্রীর মৃত্যুর সাত মাস পরেই সূর্যেন্দুবিকাশের অন্তর্ধান।

হিরণ তখন ছ' বছরের ছেলে, মাতৃক্রোড়ের মমতার মোম তখনও বন্দনার গালে। বিধবা মাসীমা ছিলেন কোন এক মেয়ে কলেজের অধ্যাপিকা। তিনিই সযত্নে গড়ে তুলেছেন ওদের।

গড়ে তুলেছিলেন ঠিক নিজের আদর্শের আক্রন্তে। মিশনারী ইস্কুলে পড়তে পেরেছে বন্দনা, মিশতে পেয়েছে দাদার বন্ধুদের সঙ্গে ওর কলেজী জীবন অবধি। ওরা ভাই বোন পরস্পরে বন্ধুবিনিময় ঘটিয়েছে অঘটনের মধ্যে দিয়ে নয়, স্বাভাবিকভাবে। মাসীমা শেষ দিন অবধি পাড়-ওলা কাপড় পরতেন, কিন্তু রঙিন শাড়ী দু'চোখে দেখতে পারতেন না। তাই। তাই, বন্দনা পুরুষ সতীর্থদের সঙ্গে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলেছে, কিন্তু ব্যাগাটেলি বা ক্যারম খেলতে পায় নি। স্টিমার পার্টিতে যেতে পেয়েছে, কিন্তু সিনেমায় নয়। হিরণ হয়ত বন্দনার চেয়ে একটু বেশি স্বাধীনতা পেয়েছে, তবু তার সামনেও নির্মলনলিনী বংশ গৌরবটা তুলে ধরতেন। বনেদী না হোক্—বুনোও নয়। সূর্যেন্দুবিকাশের অর্থের আতিরিক্ত্য ভুলতে দেননি নির্মলনলিনী। টাকার গর্ব থাকবে, অথচ টাকাকে ভালবাসবে না, এই তিনি চাইতেন। নিঃস্বার্থও হবে না, আবার পরের স্বার্থের দিকেও চোখ রাখতে চেষ্টা করবে। অর্থাৎ, উত্তব মেরুর সঙ্গে দক্ষিণ মেরুর একটা যোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

অতএব। অতএব, হিরণ সরকারের দোষ নেই, সে যদি রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রজাপতিপণা করে। কখনো এ-দলে, কখনো ও-দলে, তবু সব দলই ওকে কাছে টানে। কারণ, ওর কাঞ্চনাধিক্য যে-কোন দলকে কৌলীন্য দিতে পারে। ও কখনো একটা দলকে ধরে থাকে নি। ঘরের সুবিধা, আর বাইরের সম্মানলোলুপতা—দু'য়ে মিলে ওর রাজনৈতিক জীবনকে করে তুলেছে পায়রা-পাখনার শাট্‌লকক্।

বোন বন্দনারও দোষ নেই। ছোটবেলা থেকে না হোক্, পরিপূর্ণ যৌবনে সম্পূর্ণ স্বাধিকার পেয়েছে সে। স্বাতন্ত্র্য আর স্বায়ত্তের মধ্যে মানুষ। তাই বন্দনাও হয়েছে একটু অন্য ধরনের।

ঘাসফড়িং লাফিয়ে ওড়ে, আর উড়ে লাফায়। বন্দনার প্রকৃতিটাও ঠিক ঐ রকমের। ওর হঠাৎ খেয়াল হয়, বাজে হল্লার মধ্যে জীবন কেটে যাচ্ছে, একটু নিয়মানুগত্য আনতে হবে। একটু প্রয়োজনের পদ্ধতি। তাই স্থিতিবান হবার জন্য হৈ চৈ করে ওঠে ও।

বন্ধন বিস্বাদ লাগে আবার। কি হবে সিদ্ধার্থের সিদ্ধিতে, চিন্তাব চারণে। জীবন উপভোগ করতে হবে, ফুলঝুরির ফুৎকারেব মত, হাউইয়ের ফুলের অজস্রতায়। হৈ চৈ করতে হবে। হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে নেচে গেয়ে হেসে লাফিয়ে জীবন কাটাতে হবে। অতএব। ধীর স্থির ভাবে কাগজ কলম টেনে নেয় বন্দনা। হৈ হুল্লোড়ের প্রোগ্রাম তৈরী করে, ঘর সাজায়, মেনু মক্শ করে, চীনে লণ্ঠন কিনে আনে।

নিজে হৈ চৈ করেই আনন্দ পায় না বন্দনা। হিরণকেও টেনে আনে। ও চায়, ওর বন্ধুদের নিয়ে হিবণও হৈ চৈ করুক। দিক্ পার্টির আনন্দ, আব আশাব পাথেয়। বন্দনাও চায় হিবণেব চারপাশে একটা কুয়াশাব সৃষ্টি করতে, যেমনটি সে বচনা কবেছে তার নিজের চারপাশে। 'সেকি, তোমাকে না হলে কি আমাব চলে? গ্র্যাণ্ডে, গ্রেট্ ইস্টার্নে ছোটাছুটি করবে কে জাস্টিস রায়েব ছেলে ছাড়া।' তারপরই হয়ত একদিন। 'না, ভাল লাগে না, এ সময় আমি একটু পড়াশুনো করি। আপনি বিকেলের দিকে আসবেন।'

অর্থাৎ। যশ আর জয়ন্তী, আদর আব আপ্যায়ন, প্রশংসার প্রতিমা হতে কে না চায়। আশ্চর্য! অদ্ভুত! অবোধ্য!

এমনি একটা রহস্য-ঘেরা কুয়াশা সৃষ্টি করতে চায় বন্দনা। শুধু তার নিজের চারপাশেই নয়। হিরণের চারপাশেও। আর, যতই মেঘের আড়ালে তুমি নিজেকে ঢাকতে চাইবে, সূর্যের শল্য ঠিক সেদিকেই ছুটবে।

হিরণেরও হল তাই। মেয়েদের দিকে কোন স্বাভাবিক আকর্ষণই যেন নেই ওর, এমনি মুখের ভাব। সব সময়েই ভুরু কুঁচকে আছে, চিন্তাগ্রস্তের গ্রাস যেন ঢেকে রেখেছে ওকে। যেন নিউটনের মত চোখের সামনে দেখছে গাছ থেকে আপেল পড়তে।

বন্দনার বন্ধুদেরই কেউ একজন বলেছিল কথাটা।—এত ভাববার কি আছে হিরণ, কামড় দিয়ে দেখনা মিষ্টি কিনা। কোত্থেকে আর কেন পড়ল সে ভেবে লাভ কি ?

হিরণ বুঝতে পারে নি কথাটা, ভেঙে বলবার মত সাহসও ছিল না সুমিত্রার। ব্যাডমিণ্টন খেলতে গিয়ে তবুও সেদিন ওকেই পার্টনার বেছে নিয়েছিল।

শুধু সুমিত্রাই নয়। আরো অনেক, অনেক রঙিন জর্জেট আর রামধনুকের মনে মনোবেদনা বেড়ে চলে। হিরণের হুঁশ নেই। অনেক প্রার্থী। পার্থপ্রাপ্তির প্রত্যাশী।

কিন্তু।

ওদের আরো, আরো জাগরী রাতের আশা আকাঙ্ক্ষা, অনেক সুখস্বপ্ন আর কামা কল্পনাকে ভেঙে দিল একটা দমকা হাওয়া। ওদের বাতাসের প্রাসাদ টলে পড়ল।

হিরণ হঠাৎ বিয়ে করে বসল একটি গ্রাম্য মেয়েকে।

পনের দিনের প্রোগ্রাম। হিরণ আর বন্দনা দলবল নিয়ে পিকনিকে বেরিয়েছিল। মরা-গাঙ আর ভরা-গাঙের জল কেটে কেটে, নদী আর নৌকোর নতুনত্ব থেকে নবনীর আস্বাদ গ্রহণে বেরিয়েছিল ওরা। সঙ্গে ছিল প্রয়োজনীয় সব কিছু। বয় আর বাবুর্চি। আর হিরণের দোনলা বন্দুকটা। ছোট বড় ধারাল ছুরিও দু'চারটে ছিল বইকি! সুন্দরবনের দিকে চলেছিল ওরা,

শিকারে। বোট-পুলিশের চোক ফাঁকি দিয়ে—সময়টা শীতকাল, গর্ভবতী হরিণীর প্রাচুর্য এখন নদীর ধারে ধারে, সাত ব্যাটারির শিকারী-টর্চ ফেললেই মোহগ্রস্ত হরিণীর দল কি অবাক বিস্ময়ে ছুটে আসবে না? তারপর, একটি মাত্র এল্ জি'র এলাকায় ককিয়ে কাতরানি খাবে নধরদেহী কোন মৃগমাতৃকা! নৌকোর মুসলমান মাঝি ওস্তাদ সাঁতুরে, টুপ করে পাড় থেকে তুলে আনবে সে। পাকাহাত বাবুর্চির দ্বারা সৎকারটা মন্দ হবে না।

হিরণ ওদের আশা দিয়ে নিয়ে এসেছে। খোলা মাঠ আর বনে হরিণের দল ঘুরে বেড়ায়, মানুষ তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে, এই লোভেই বন্দনারা এসেছে। বন্দনা তাই প্রতিদিনই বলে, হরিণ কই দাদা? হিরণ বলে, আসবে, আসবে। আর দু'টো দিন সবুর কর।

সবুর করে চলে! এগিয়ে চলে নৌকো, দিনের দাক্ষিণ্যে, কখন বা রাতের রিক্ত অন্ধকারে।

চাঁদের আলো পড়েছে সেদিন নদীর পাড়ে। কাছাকাছি একটা গ্রাম। খড়ের চালগুলো জ্যোছনা লেগে চিকচিক করছে। দূরে দূরে জোনাকির ঝনক্। নিঃশব্দ আর নিস্তব্ধ রাতের বুকে দু'একটা বাদুরের পাখা ঝাপ্‌টানোর আওয়াজ।

একটা লণ্ঠনের আলো অনেক দূরে। হিরণ মাঝিকে বললে, লণ্ঠন নিবিয়ে দে। রিভার পুলিশ হয়তো ডিঙি নৌকোয় টহল দিচ্ছে। অতএব আলো নিভিয়ে দেওয়া চাই। তা না হলে পিছু নেবে ওরা, আর গুলির শব্দ শুনলে এসে ধরবে হাতেনাতে। ফরেস্ট-আইনে এ সময়টায় যে হরিণী মারা নিষেধ।

বন্দনা শিউরে ওঠে।—পেটে বাচ্চা থাকবে, মাগো। না, না, তার চেয়ে হরিণ মেরো। শিশু্ থাকলে তবেই—

হেসে ওঠে হিরণ, মেয়ে কি আর সাধে বলে হরিণরাও

আইন বোঝে, এ সময় একটা হরিণও বেরুবে না। আর মেয়েদের মত পুরুষ হরিণরা তো বোকা নয়, বোঝে এইটেই শিকারের সময়।

চাপা স্বরে ওদের গল্প চলতে থাকে। সুমিত্রা বলে, আমার ভাই গা ছমছম করছে। এই বলে সে উঠে এসে বসে হিরণের পাশে। লতিকা বলে, আমারও। সেও উঠে এসে হিরণের পাশে জায়গা করে নেয়। রাতের নিঃশব্দতার মাঝ দিয়ে স্রোত কেটে চলে বজরা নৌকো। দাঁড় টেনে চলে মাঝির দল, সর্দার গান শুরু করে নীচু গলায়। এমন সময়ঃ

এমন সময়, চমকে উঠল সকলে। অদূরের গ্রাম থেকেই কি আর্তনাদটা ভেসে আসছে? কাতর মেয়েলী কণ্ঠের কাকুতি ভেসে আসছে। পাড়ে নৌকো ভিড়াতে বললে হিরণ। টর্চ আর বন্দুক হাতে নেমে পড়ল সে। সঙ্গের পুরুষ বন্ধুদের ভেতর থেকে বেছে নিল কল্যাণকে। বললে, সঙ্গে চল্! বন্দনা বললে, আমিও যাব। অন্য মেয়েরা যেতে চাইল না।

নিলাজ, নিকাজ আলস্যের মধ্যে থেকে অদ্ভুত এক জীবনী-শক্তির স্ফুরণ হল। বন্দনা দেখলে, সেও কাজ করতে পারে, কাজে লাগতে পারে পৃথিবীর। অসম্মানের সমাধি থেকে ও একজনকে টেনে তুলল। মাধবী থরথর করে কাঁপছিল। ওর সারা অঙ্গে অত্যাচারের আখর। চুল আলুথালু। বসন বিস্রস্ত। চোখের কোণে অশ্রুর আবিলতা। মাধবী থরথর করে কাঁপছিল। ভয়ে, লজ্জায়, বিস্ময়ে। কান্না রোধ মানছিল না ওর।

অত্যাচারীও ধরা পড়েছিল একজন। আর সকলে পালিয়েছে। ধৃত ব্যক্তির কাছেই জানা গেল ইতিহাস। অনেক দূরের গ্রাম থেকে নৌকোয় নিয়ে আসছিল ওরা মাধবীকে। পাঁচশ টাকার

স্রোতে। গ্রামের ভেতর দিয়ে মুখ বেঁধে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা আছে বলেই বাঁধন খুলে দিয়েছিল ওরা। বন্দনা বললে, আর কোন ভয় নেই তোমার মাধবী। তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যাব আমরা। হঠাৎ চমকে চোখ তুলে যেন সজল চোখে অসম্মতি জানালে মাধবী। তারপরই আবার বুক ছুঁয়ে নুয়ে পড়ল ওর মাথা, লজ্জায়। ওরা ধীরে ধীরে নৌকোর দিকে পা বাড়ালে। মাধবী কিন্তু মাথা তুলতে পারছিল না। বন্দনা ওর পিঠে সান্ত্বনার নরম হাতখানা রেখে ওকে কাছে টানতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল সে বন্দনার কাঁধে। ডুকরে কেঁদে উঠল মাধবী। বন্দনা বুঝতে পারলে। ওর মেয়েমানুষের মন বুঝতে পারলে গোপন লজ্জার ইতিহাস। ইচ্ছে হল বন্দনার, ধরা-পড়া লোকটিকে জীবন্তে কবর দিতে। মাধবীকে বললে, কাঁদছ কেন বোন, এ অন্যায় তো আর তোমার নিজের ইচ্ছেয় ঘটেনি। কথাটা বললে হিরণদের আড়ালে। আরো বললে, তুমি আমার বোন, নিজের বোন। ভয় নেই, কেউ জানবে না। আর, আর পুরুষমানুষ, অত ওরা বোঝে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, এরজন্যে সমাজ তোমাকে কোন শাস্তি দিতে পারবে না। কিন্তু। মাধবী ফিরবে না দেশের গ্রামে।

বেশ তো। বন্দনা বললে, তুমি চল আমার সঙ্গে।

কলকাতার শহুরে মাটিতে মাধবীর আগমন ঘটল।

চাঁচড় আর চিক থেকে মোজেক মার্বেল, পাঁক প্রাঙ্গণ আর প্লাবনের জীবন থেকে স্থির আর স্থূল শহরের জীবন। তাই কি, মায়ার মৌনতা মাধবীর মুখে। কিন্তু, মাধবীর কান্না বোধ মানে না কেন। মুখ তুলতে পারে না কেন ও, বন্দনার সামনেও। লজ্জায় লুকিয়ে থাকে কেন।

কোন এক নিরিবিলি সন্ধ্যার দীর্ঘশ্বাস মাখা বেদনাবাক্যে

হিরণ হঠাৎ বন্দনাকে বললে, বুঝলি বন্থু, এর জীবনে কি ঘটেছে খোঁজ করে জানতে হয় না, মুখ দেখলেই বোঝা যায়। অর্থাৎ, হিরণও বুঝেছে। দোষ তো মাধবীর নয়। বন্দনা বললে। বললে, তবু সমাজ কি ওকে ফিরিয়ে দেবে আগের সম্মান ? হিরণ গভীর ব্যথায় উত্তর দেয়, দেওয়া উচিত জানি, দেবে না তাও জানি। কিন্তু, আমাদের যতখানি শক্তি আছে তাকে কাজে লাগাব আমরা।

কি করতে পারবে তুমি।

একজনকেও যদি সমাজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি সসম্মানে।

টাকার লোভ দেখিয়ে যে-কোন একজনের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে মাধবীর অপমান ঘটিও না। তার চেয়ে, আমি ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেব। স্বাধীনভাবে ও যাতে বাঁচতে পারে।

হিরণ হয়ত ঠিক এই কথাই বলতে চায় নি। কিন্তু, বন্দনার কথায় ও ওর মনের ভাব পরিষ্কার করে বোঝাতে পারলে না। হয়ত বা কে জানে, মাধবীর লজ্জাধিক্য ওর মনেও লজ্জার লহরী তুলেছে।

মেঘ-মাখান আকাশের গায়ে দু'একটা অতৃপ্ত তারকার কণিকা জ্বলছিল। স্পষ্ট হয়ে ফুটতে চায় তারা, ফুল ফোটাতে চায়। তবু বন্দনা যে ওর চেয়ে অনেক ছোট। আর না বোঝালে বন্দনাই বা বুঝবে কি করে। জানবে কি করে, অস্তগামী চাঁদের জন্য উদয়োন্মুখ সূর্যের অন্তরে প্রীতির পিপাসা জাগতে পারে।

সত্যি। এ এক বিচিত্র পৃথিবী। যে ঠিক তোমারই মত, বাক্যে ব্যবহারে, পরিচয়ে প্রসাধনে,—তাকে তুমি ভালবাসতে পার। কিন্তু যে ঠিক তোমার উল্টো প্রকৃতির, যার মধ্যে তুমি পাওনা তোমার নিজের মনকে খুঁজে, অর্থাৎ যাকে দেখে মনে হবে একেবারে ভিন্ন পৃথিবীর মানুষ—তাকেও পারবে না তুমি

উপেক্ষা করতে। তোমার দেহে আর মনে বৈচিত্র্যের রঙ ফোটাবে সে, আনবে রোমাঞ্চের বাতাস।

এদের একজন হল মনের মত মানুষ, আর একজন মন-মাতান মানুষ।

হিরণ স্বতঃস্ফূর্ত। ঝড়ো সমুদ্দুরের মত তার প্রাণাবেগ। এতটুকু খুঁত নেই তার চলায় বলায়, আলাপে আলোচনায়।

স্বভাবে সম্ভাবনায় এদিকে মাধবী গ্রামিণী। বিষণ্ণতায় ব্যাহত। তাই হয়ত হিরণের মন মেতে উঠল।

বন্দনা প্রথমটা টের পায়নি হিরণের ভাব। বুঝতে যখন পারলে, কথা পাড়লে সে নিজেই। লজ্জা পেল না। মাধবীর মৌনতায় সম্মতি না অসম্মতি তা কেউ ভেবেও দেখলে না। বিয়ে হয়ে গেল হিরণের।

গ্রাম্য আর গরীব হতে পারে মাধবী, কিন্তু হিরণের টাকার অভাব নেই। পুষ্পশয়নের রাতে আলো আর আমন্ত্রিতের বাহুল্য তো দেখা যাবেই। পরিপাটি করে সাজান ঘর। অজস্র রঙিন সজ্জা আর শয্যার রক্তিম কুসুম বর্ণ, গন্ধের আতিশয্য আনল ঘরের বাতাসে। এক অদ্ভুত দেশ যেন। মেঘের আড়ালে সাতরঙা সেই রামধনুকের দেশ। ইভনিং-ইন-প্যারিসের সুগন্ধ আনল পরীর দেশের প্রাচুর্যের সন্ধ্যা।

বন্দনাও উচ্ছ্বসিত।

বন্ধুবান্ধবদের বিদায় দিয়ে হিরণ আর মাধবীকে পাঠিয়ে দিল সে প্রথম মিলনাশ্রয়াকাঙ্ক্ষী শয্যায়। রজনীগন্ধা আর চম্পক ফুলের সুবাস সেখানে ইঁট, কাঠ আর কংক্রিটের আচ্ছাদনকে করে তুলেছে নিরুক্ত নিশীথের নীড়। মাধবী কি লজ্জায় মুখ গুঁজেছে বালিশে? রেডিওটা খুলে দিয়ে কাঁটা নির্দেশ করল হিরণ, কোন এক ওপারের অজানা বেতার কেন্দ্র। জাজ্ সঙ্গীতের

তালে তালে ট্যাপ ডান্সের সঙ্গত। কেদারাটা টেনে নিয়ে বসলে সে রেডিওটার সামনে। একটা সিগারেট ধরালে। চুরুটিকার চঞ্চু থেকে ধোঁয়ার ফিতে উঠছে দুলে দুলে। সেদিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে চেষ্টা করলে সে। না, এতদিনে হিরণের দাঁড়াবার অবকাশ হয়েছে। পেয়েছে অফুরন্ত অবসর। শান্তির। কিন্তু। মাধবী কি কাঁদছে? বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদছে সে। হিরণ বিস্ময়ে ফিরে তাকাল। বিস্মিত হল হিরণ। এই যে আজ এসেছিল অসংখ্য মেয়ের দল, সুন্দরী আব সুকন্যা সপ্তদশীর দল, তাদের মুখে কি ছিল এতটুকু হাসি? তবু মাধবী কাঁদবে কেন? কলুষ থেকে কল্যাণের পথে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে হিবণ। ওর নিরপবাধ গ্লানির নির্মোক তুলে নিয়েছে সে। সুপ্ত সমাজের মনকে নাড়া দিয়েছে, ফিরিয়ে দিয়েছে মাধবীর লুপ্ত সম্মান। তবু মাধবী কাঁদবে কেন? মাধবী কিন্তু ভাবছিল অন্য কথা। সংস্কারের শৃঙ্খলে বাঁধা ওর মন। অশুচি আব অন্তর্দাহী নিকটাতীত কোন কিছু মুছে ফেলা সহজ নয়। মাধবীর চেয়ে বেশী কে জানবে যে, যা ঘটেছে তার ওপর কোন হাত ছিল না তার নিজের। রোধ করবার উপায় ছিল না। ষোল বছবের সমাজের সম্মোহন ওকে মানুষ করে তুলেছে। আজ আব নির্মল নির্মাল্য নেই ওর কপাল ঘিরে। কীটগ্রস্ত। অশুচি অন্তর নিয়ে ও কি করে দাঁড়াবে স্বামীর সামনে! কি করে মুখ তুলে তাকাবে? দেবে সংগোপনে সঙ্গ? তাই। মাধবী কাঁদছিল। আত্মগ্লানির কান্না! লজ্জার কান্না। হিরণ অনেকক্ষণ লক্ষ্য করলে তাকে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে এল মাধবীর কাছে। স্বস্তিবাচনের মত মৃদু হাতের সান্ত্বনা রাখলে তার পিঠে। সহানুভূতির ছোঁয়াচ লেগে মাধবীর কান্না সশব্দ হয়ে উঠল। হিরণ আর কিছু বললে না; না ভাষায়, না ভঙ্গিতে। ও ভাবলে,

হয়ত বা আজকের রাতের বৈচিত্র্যে ওর মনে বেদনার জোয়ার এসেছে। আজকের মাধবীকে শান্তি দাও।

ক্রমে। কখন যেন ঘুম নেমেছিল হিরণের চোখে। সন্ধ্যা-কাশের বিহঙ্গের মত ধীরে ধীরে নেমে এসেছিল ঘুম। নেমে এসেছিল নিস্তব্ধ নিশীথের নিদ্রার নম্রতা। তারপর। হঠাৎ। ভোরের আলো তখন চমক দেয়নি। তাবার চিত্রলেখা আর আশিস-ভরা আকাশের কপালে ঐ চাঁদের বিন্দুটা তখন মিইয়ে আসে নি। তন্দ্রাক্রান্ত চোখ চেয়ে হিরণ তাকাল। হঠাৎ কি একটা শব্দে যেন ঘুম ভেঙে গেছে তার। হিরণ তাকাল চারপাশে। ওর চোখের দৃষ্টি প্রতিঘাত পেল কয়েক ফোঁটা অজ্ঞাত অশ্রুর চিহ্নে। চঞ্চল চোখে চারপাশে তাকালে হিরণ। না। নরম বালিশের ওপর আরো নরম গাল বেয়ে পড়া অশ্রুর ছাপ। কয়েকটি চুল, আর অল্প একটু সিঁদুরের দাগ। কিন্তু মাধবী নেই।

রক্তবীজ

নীলিমা মনে মনে ভেবেছিল চাকরিটা নিশ্চিত হয়ে যাবে। এর আগেও দু'চার দিন এসে দেখা করে গিয়েছিল ও ছোট সাহেবের সঙ্গে, আভাষে ইঙ্গিতে এটুকু স্পষ্ট করেই জানিয়েছিল মিস্টার ব্যানার্জি যে, ভ্যাকান্সি যদি হয় আর নীলিমা যদি ইণ্টারভিউ পায় তা হলে চাকরিটা তারই জন্যে তোলা থাকবে। এমন কি, এর আগের সপ্তাহে যখন নীলিমা রুটিন মাফিক মনে পড়াতে এসেছিল, তখনও ব্যানার্জি বলেছিল, বেশি দেরি নেই আর, বড় সাহেব মিস্টার গাঙ্গুলী স্বয়ং চেষ্টা করছেন একটা ভ্যাকান্সি তৈরী করবার জন্যে।

কিন্তু কোত্থেকে কি হয়ে গেল! পাঁচ মিনিট আগেও নীলিমা ভাবতে পারেনি, যে-চাকরির জন্যে মাসের পর মাস রোদে পুড়ে জলে ভিজে এর-ওর-তার তাঁবেদারি করে বেড়িয়েছে ও, কাউকে ঠাণ্ডা কথায়, কাউকে মিষ্টি হাসিতে আর কখনো বা অনুনয়ে আব্দারে মন ভুলিয়ে যে চাকরি পাবার স্বপ্ন দেখেছে ও এতদিন, তারই এপয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা ও এমনভাবে ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে ফেলে দেবে!

যথারীতি সাজগোজ করে কাঁধে ফুটফুটে সাদা চামড়ার ব্যাগ ঝুলিয়ে ও যখন বড় সাহেব মিস্টার গাঙ্গুলীকে নমস্কার করল, তখন এতটুকু হাত কাঁপেনি ওর, কার্পেট-বিছানো মেঝে পার হয়ে বড় সাহেবের টেবিল অবধি হেঁটে যেতে পা টলেনি একবারও। বেশ সপ্রতিভ ভাবেই সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ও, 'বসতে পারি?' জিগ্যেস করেছিল মোলায়েম গলায়, আর গাঙ্গুলী

সাহেবের "নিশ্চয়, নিশ্চয়, বসুন আপনি বসুন, মাফ করবেন, কাজের তাড়ায় ভুলেই গিয়েছিলাম"—ধরনের উচ্ছ্বাসমুখর ভদ্রতায় ও একটুও বিগলিত না হয়ে প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছিল।

তারপর গাঙ্গুলী সাহেব জিগ্যেস করেছিলেন, তা' হলে কবে থেকে আপনি জয়েন করতে পারবেন?

নীলিমা হেসে বলেছিল, যদি বলেন তো আজ থেকেই।

—না, না। আপনাকে তৈরী হয়ে নেবার জন্যে কিছু সময় দিতে হবে তো। আপনি বরং নেক্সট উইক থেকে···

—বেশ তো, তাই আসব। নীলিমা খুশিমুখেই জানিয়েছিল।

—কিন্তু আপনার টার্মস্‌গুলো বোধ হয় ঠিক জানেন না। মানে, পোস্টটা আমাকে হেড আপিসে লিখে নতুন করে ক্রিয়েট করতে হল কিনা, তাই এখন মাইনেটা একটু কম।

নীলিমা বিনীত হবার চেষ্টা করেছিল—অভাবের সংসারে তবু তো কিছুটা কষ্ট কমাতে পারব, মাইনে যা হোক্

গাঙ্গুলী তা সত্ত্বেও মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছিল, না, মানে এখন অবিশ্যি পঁচাত্তর টাকা দিচ্ছে, তবে দু'এক মাসের মধ্যেই যাতে অন্তত একশো হয় তার চেষ্টা আমি করব। তা ছাড়া আপনার দাদা আমার বন্ধু ছিলেন, তিনি আজ নেই বলেই তো আর সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি

—তার পরিচয় তো আপনি দিয়েছেন। এত ঘোরাঘুরি করে তো দেখলাম, আজকের দিনে চাকরি দেয়া সহজ নয়। আপনি আমার জন্যে যথেষ্ট করেছেন।

কথা কেড়ে নিয়ে গঙ্গুলী বলেছিল, সেই কথাই বলছি। এখন এই মাইনেতে ঢুকলে ছ'মাসের মধ্যেই একটা লিফ্‌ট্ হয়ে যাবে।

আর তা ছাড়া আমেরিকান কোম্পানীর আপিস, খেয়াল-খুশি মাফিক মাইনে বাড়ায় ওরা।

—আমার এখন পঁচাত্তর টাকা হলেই যথেষ্ট, না বাড়ালেও ক্ষতি নেই। গাঙ্গুলীকে এত বেশি লজ্জিত হতে দেখে নীলিমা বলতে বাধ্য হয়েছিল।

আর গাঙ্গুলী এপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নীলিমার হাতে দিয়ে বলেছিল, এটা আর পোস্টে পাঠিয়ে কি হবে, ডাকের গোলমালে হারিয়ে যেতে পারে। তা' হলে নেক্সট উইক থেকেই। কেমন?

কাগজটা হাতে নিয়ে নমস্কার করে উঠে দাঁড়িয়েছিল নীলিমা।

—আচ্ছা নমস্কার। আসি তবে।

—হ্যাঁ। নেক্সট উইক থেকে। সোমবারই জয়েন করছেন তা হলে? বেশ। তারপর গাঙ্গুলীও উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল, পঁচাত্তর থেকে একশো করে দেব বলছি, পাঁচশোও হয়ে যেতে পারে, কি বলেন? বলে হেসে উঠেছিল।

বিস্মিত সস্মিত চোখে ফিরে তাকিয়েছিল নীলিমা।

—বুঝলেন না? যেমন ব্যাপার-স্যাপার দেখছি, আরেকটা যুদ্ধ তো লাগল বলে, এবার যুদ্ধটা লাগলেই দেখবেন আমাদের সকলেরই বরাত খুলে যাবে। আমেরিকান কোম্পানী, বুঝলেন না, পঁচাত্তর থেকে পাঁচশো হয়ে যাবে দু'দিনে। হো-হো করে প্রাণ খুলে হেসে ওঠে গাঙ্গুলী, আর পরমুহূর্তেই নীলিমাব চোখে চোখ পড়তেই হাসি মিলিয়ে যায় তার মুখ থেকে।

দুর্বোধ্য বিস্ময়ে কিছুক্ষণ গাঙ্গুলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নীলিলা, আর ক্রমশ ওর চোখের তারায় যেন একরাশ বিরক্তি, ঘৃণা, ক্রোধ ধীরে ধীরে এসে জমা হয়। পিছনে পিছনে, ওর চোখের নরম পাপড়ির আড়ালে আড়ালে দু'ফোঁটা অশ্রুও হয়ত!

একদৃষ্টে বহুক্ষণ গাঙ্গুলীর মুখের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে নীলিমা, তারপর খুব ধীর-সুস্থির হাতে আস্তে আস্তে এপয়েন্টমেণ্ট লেটারটা একবার ভাঁজ করে, ছিঁড়ে ফেলে, আবার ভাঁজ করে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে, মাফ করবেন আমাকে, এ চাকরি আমি নিতে পারব না। বলেই দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নেমে পড়ে। যুদ্ধ, যুদ্ধ —একটা শব্দ বার বার ওর কানের চার পাশে ঘুরে বেড়ায়। যা ভুলে যেতে চায়, বা মুছে ফেলতে চায়, বারংবার তারই মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। আশ্চর্য!

স্বামী ওষুধ পাবে না, পথ্যি পাবে না। মণ্টুর ছ' বছর বয়েস হল, এখনো ইস্কুলে ভর্তি করা গেল না। রুনির জন্যে নতুন একটা ফ্রক কেনা দরকার, উপায় নেই। দেওর হয়ত ফি দিতে পারবে না পরীক্ষার, আর ধার-ধোর করে ফি যদি বা জোটে তো সাত মাসের কলেজের বাকী মাইনেটা মেটাতে পারবে না। তা হোক্।

চাকরিটা না নিয়ে ও ভালই করেছে, ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরল নীলিমা। বাসাই বটে। ট্রাম-লাইন থেকে পুরো পঁচিশ মিনিট ধরে এ-গলি-ও-গলি করে ঊনবিংশ শতাব্দীর স্মৃতিমুখর একটি বিরাট পুরনো পচা ধসা প্রাসাদের দেয়ালে কাঁধ ঘষে ঘষে সরু একটা জলো গলি পার হয়ে ঘুঁটে-গোবরের নোংরা দুর্গন্ধ সহ্য করে দু'টো পরিবারের অন্দর ডিঙিয়ে তবে ওদের ছোট্ট বাসা। এর চেয়ে বস্তির ঘরও হয়ত ভাল ছিল। ভাড়াও হয়ত কম হত। কিন্তু যে পথেই পা ফেলতে গেছে নীলিমা সেখানেই একটা বড় হরফের 'কিন্তু' এসে নাক ঢুকিয়েছে। সত্যি, উপকার পাবার মত, সাহায্য পাবার মত লোক আজ খুব কমই আছে নীলিমার, তবু এখনো তো পুরনো দিনের অনেকের সঙ্গে দেখা-

সাক্ষাৎ হয়, আত্মীয় স্বজনদের কেউ এখনো তো হঠাৎ এসে হাজির হয়, খোঁজ খবর নেয়। তাই বস্তিতে উঠে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না নীলিমা। তার চেয়ে···

জুতো-জোড়া খুলে সযত্নে কাগজের বাক্সটায় ভরে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখলে নীলিমা, ব্যাগটা ভরলে ভাঙা ট্রাঙ্কের ভেতর, শাড়ী আর ব্লাউজ বদলে, সে দু'টো ভাঁজ করে বিছানার বালিশের তলায় রাখলে—তিন মাস আগের ইস্ত্রির পালিশটা যাতে নষ্ট না হয়। ইতিমধ্যেই স্বামীর সঙ্গে দু'একবার দৃষ্টি-বিনিময় হল নীলিমার, রুগ্ন অসহায় দু'টো চোখ কি একটা প্রশ্ন করতে যেন ভয় পাচ্ছে।

—নাঃ, হল না। ওরা অন্য লোক নিয়েছে। একটু হাসবার চেষ্টা করে স্বামীর পায়ের কাছে এসে বসল নীলিমা।

মৃণ্ময় ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে আরো ম্লান হয়ে গেল। বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করল, পারল না। পায়ের কাছ থেকে এগিয়ে এলো নীলিমা, মৃন্ময়ের মাথায় হাত রাখলে। ভাবতো, এ রোগ-পাণ্ডুর ব্যথা-কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে আর কত দিন কাটাতে হবে ওকে? ক্রমশই যে বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে মৃন্ময়! যাবেই তো। তিন মাস হয়ে গেল, আর তো এক্স-রে নেয়া হল না, ডাকা হল না ডাক্তারকে। ডাক্তারকে খবর দিলে সে আসত ঠিকই, ফি চাওয়া দূরের কথা, নিজের থেকেই বলতো টাকা দিতে হবে না। কিন্তু সে তো মৃন্ময়কে বাঁচাবার জন্যে আসত না, আসত মৃন্ময়ের আয়ু কমিয়ে দেবার জন্যে। অন্য ডাক্তার ডাকার কথাও ভেবেছে নীলিমা, ফিয়ের টাকাও জোগার করেছে, কিন্তু—কিন্তু ডাক্তার আর এক্স-রে তো রোগ সারাতে পারে না? রোগ সারাবার ওষুধের দাম কোথায় পাবে ও, এ রোগের পথ্যিই বা জুটবে কোত্থেকে!

মৃন্ময় অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে থেকে হঠাৎ বললে, সানুর তো এমনিই পরীক্ষা দেয়া হবে না, ও-ই একটা চাকরির চেষ্টা করুক না?

নীলিমা হাসল।—ঠাকুরপো চাকরি করবে? পনেরো বছরের একটা ছেলেকে কে চাকরি দেবে? আর আমিই যখন পাচ্ছি না, ও পাবে কি করে?

পাশের ঘরে পড়ছিল সানু, ওদের কথা শুনে বই বন্ধ করেছিল। এবার উঠে এল সে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

নীলিমা হেসে হাল্কা হবার চেষ্টা করলে।—কি ঠাকুরপো! পরীক্ষার ফি? মন দিয়ে পড় ভাই, সময়ে ঠিক জোগাড় করে দোব।

—না বৌদি, পরীক্ষা এবার আর দোব না। দিলে ফেল করব। তার চেয়ে টাকাটা নষ্ট না করে আমি বরং একটা ট্যুইশনি নিই। বিজন বলছিল, ওর এক ভাই ক্লাস থ্রিতে পড়ে···

নীলিমা ধমক দেয়, খুব হয়েছে, তুমি এখন পড়তে যাও তো। পরীক্ষা দিয়ে যা করতে হয় করো।

সানু মাথা হেঁট করে সরে যায়, আবার বই নিয়ে বসে।

মৃন্ময় বলে, ও বেচারীকে বকলে কেন? সত্যিই তো, ও যদি কিছু রোজগার করতে পারে।

—হ্যাঁ, রোজগার করবে ঠাকুরপো! আজ দশটা টাকা পেলেই সব সমস্যা মিটবে, নয়? তারপর? ওর ভবিষ্যৎটা ভাবছ না কেন? আর, আর আমরাও তো ওর মুখ চেয়েই আছি। ভবিষ্যতে ও-ই হয়ত আমাদের সুদিন আনবে।

—ভবিষ্যৎ! বিষণ্ণ হাসি হাসলে মৃন্ময়। —সত্যি, ভবিষ্যৎ ছাড়া আর গতি কি, কে-ই বা চাকরি দিচ্ছে ওকে! নাঃ, আবার যুদ্ধ-টুদ্ধ না লাগলে আর···

কথা শেষ করতে পারল না মৃন্ময়। নীলিমা চিৎকার করে উঠল হঠাৎ, চুপ কর, চুপ কর তুমি।

চমকে উঠল মৃন্ময়। অর্থহীন ভাসা-ভাসা দু'চোখ মেলে বাথাহত দৃষ্টিতে তাকাল ও নীলিমার দিকে। দেখলে নীলিমাব চোখে আক্রোশের আগুন।—চুপ কব, চুপ কর তুমি। ও কথা কোন দিন তুলো না তুমি, কোন দিন না। চিৎকার করে ধমক দিয়ে উঠল নীলিমা। তারপর মৃন্ময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে লজ্জায় বিস্ময়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে মৃন্ময়, অসহায় শক্তিহীন দু'চোখের কোণ বেয়ে অভিমানের অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

লজ্জায় দুঃখে নীলিমার মুখ সাদা হয়ে গেল। ছি ছি! এ কি করল সে। কতদিন, কত বছর কেটে গেছে এই দারিদ্র্যের মধ্যে, এমনি ব্যর্থতার মধ্যে, কৈ কোন দিন তো ধৈর্য হারায়নি ও? এমন কি গাঙ্গুলীর কথা শুনে ও যখন এমনি আক্রোশে ফেটে পড়েছিল ভেতরে ভেতরে, তখনো তো বাইরে কোন চাঞ্চল্য কোন অধৈর্য দেখায়নি ও? অনেক শান্ত স্বরে জবাব দিয়েছিল, অনেক ধীব হাতে ফেলে দিয়েছিল কাগজটা।

অথচ।

আস্তে আস্তে মৃন্ময়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে নীলিমা, মৃন্ময়ের কপালে ঠোঁট ছোঁয়ালে, তারপব হাসবার চেষ্টা করে বললে, রাগ করলে? লক্ষ্মীটি, শোন, রাগ করো না, চোখ তোল, তাকাও আমার দিকে, তাকাও তুমি। সত্যি, সারা দিন রোদে রোদে ঘুরে মাথার ঠিক ছিল না আমার। রাগ করনি। বল, রাগ করনি তুমি?

মৃন্ময় হাসল।—না, না, রাগ করিনি। ওঠ, মুখের কাছে মুখ এনো না, ছিঃ!

নীলিমা আব্দার ধরলে, না, উঠব না আমি।

—ছিঃ, সরাও, মুখ সরাও। শোন, মণ্টু রুনির কথাটা ভাব, ওদের তো বাঁচাতে হবে, ওদের···

নীলিমা জবাব দিলে না, নিঃশব্দে মৃন্ময়েব সারা মুখের ওপর ওর ঠাণ্ডা নবম হাতটা বুলিয়ে দিলে, চোখের জল মুছিয়ে দিলে শাড়ীর আঁচলে।

—ঠাকুরপো! মণ্টু আর রুনি ভাত খেয়েছে? তুমি—তুমি খেয়েছ তো? হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় নীলিমা জিগ্যেস করল।

সান্নু ঘাড় নাড়লে—আমি আব মণ্টু খেয়েছি, বৌদি! পোস্তর তরকাবিটা যা ফাস্ট´ ক্লাস হয়েছিল, মণ্টু আব আমি চেটেপুটে খেয়ে নিয়েছি। হাসতে হাসতে সান্নু বললে।

নীলিমাও হাসল।—আমাব জন্যে আর রাখনি নাকি?

—ভাত আছে। পোস্তর তরকারি কিন্তু নেই। আমি কি করব, মণ্টু যে খেয়ে নিল।

—বেশ কবেছে। আমার ক্ষিদেও নেই। রুনি খেযেছে, না রাগ কবে বেবিয়ে গেছে?

সান্নু হেসে বললে, না বৌদি, ও তো বাসি ভাত খায় না।

—ও! দীর্ঘশ্বাস´ লুকোল নীলিমা। বললে, দেখ তো ঠাকুরপো, কোথায় আছে রুনি, ডেকে নিয়ে এস।

কিছুক্ষণ পরেই রুনিকে টানতে টানতে নিয়ে এল সান্নু।

নীলিমা বললে, কি, খাবি না? আয়, খাবি আয়।

—খেয়েছি তো আমি! অভিদাদের বাড়ীতে খেয়েছি আমি।

নীলিমা আহত বোধ করলে। অভিদা! সামনের তিনতলা নতুন বাড়ীটা ওদের। কিন্তু ওদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখতেও ভয় হয় নীলিমার, ঘৃণা হয়। রুনি আর মণ্টুকে কত বার তাই

নিষেধ করেছে নীলিমা, বলেছে, ওরা বড়লোক, ওদের সঙ্গে ভাব রাখা তোমাদের সাজে না।

তবু রুনির মুখে অভিদা আর অভিদা। ঐটুকু বাচ্চা মেয়ে, ও হয়ত অত-শত বোঝে না, তফাতটা ভাবে শুধু বাড়ীর চেহারায়।

নীলিমা শান্ত স্বরে বললে, তুমি আবার ওদের বাড়ী গিয়েছিলে ?

—বাঃ রে, অভিদা যে ডেকে নিয়ে গেল। মাসীমা যে খেতে দিল আমায়, তাই তো খেলাম।

—না ওদের বাড়ী যাবে না তুমি, যাবে না কোন দিন ওদের বাড়ীতে। ওরা বড়লোক, আমরা গরীব। ওরা আমাদের ঘেন্না করে, তা জান ?

রুনি চুপ করে রইল, কোন কথা বললে না। তারপর হঠাৎ নীলিমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, জান মা! অভিদা বলেছে ওরাও নাকি আমাদের মত গরীব ছিল। যুদ্ধের সময় ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছে।

না, নীলিমা রাগবে না আর। টলবে না কারো কথায়। কোন কথা না বলে থালায় ভাত বাড়তে শুরু করলে নীলিমা।

রুনু ডাকলে, মা !

—কি ?

—অভিদা বলছিল, আবার না কি যুদ্ধ লাগবে। তখন না কি চেষ্টা করলে আমরাও বড়লোক হতে পারব।

চমকে চোখ তুলে তাকালে নীলিমা রুনির মুখের দিকে। না, অধৈর্য হবে না নীলিমা, আক্রোশে ফেটে পড়বে না। রুনির মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখের হাসি হাসবার চেষ্টা করলে নীলিমা; সে হাসি হাসি নয়, হাসির বিদ্রূপ।

সমস্ত দিন, সমস্ত সন্ধ্যা নীলিমার সারা মন গভীর এক অবসাদ, দুঃসহ বিষাদের ভারে নুয়ে রইল। আশ্চর্য! যে কথা ভুলে যেতে চায় নীলিমা, যে বিষাক্ত দিনগুলোকে বিস্মৃতির সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে চায় বার বার, পৃথিবীসুদ্ধ সকলেই যেন সেই দৃশ্য-গুলোই ওর চোখের সামনে তুলে ধরে, ওর কানের কাছে বার বার একই কান্নার গান বাজায়। সমস্ত কাজের ফাঁকে নীলিমার উদাস ব্যথা কেবলই চমকে ওঠে।

পাশের ছোট্ট ঘরটিতে ওদের বিছানা পেড়ে দেয় নীলিমা, রুনিকে ঘুম থেকে তুলে খাইয়ে দেয়। রান্না ভাল হয়েছে কি না জিগ্যেস করে সান্নুকে, মন্টুকে আদর করে ঘুম পাড়ায়, জলের গ্লাস রেখে আসে সান্নুর মাথার কাছে, মশারি টাঙাবার দড়িটা রুনি কোথায় নিয়ে গেছে খোঁজাখুঁজি করে। জানালার শিকে, আলনার আঁকশিতে, টেবিলের পায়ায় আর দেয়ালের পেরেকে দড়ি বেঁধে মশারি টাঙিয়ে বিছানার চতুর্দিকে ভাল করে গুঁজে দেয় ধারগুলো, তারপর গরম তেল নিয়ে এসে মৃন্ময়ের বুকে মালিশ করে দিতে দিতে কোন ফাঁকে আবার কথাগুলো ওর মনের চার পাশে ভিড় করে আসে।

কত সুখের সংসারেই না ও মানুষ হয়েছিল! ঐশ্বর্য না থাক, সে সংসারে শান্তি ছিল, সুখ ছিল।

দোতলার ফ্ল্যাটে ছোট্ট একটি পরিবার। নীলিমা, নীলিমার মা-বাবা, দাদা সুধাকান্ত আর বৌদি, নীলিমার ছোট একটি ভাই শুভকান্ত আর বিধবা দিদি।

ভাল চাকরি করতেন নীলিমার বাবা, বেশ স্বচ্ছল ভাবেই কাটছিল ওদের দিনগুলো। সংসারে ছিল শান্তি আর শৃঙ্খলা।

এমনি সময় যুদ্ধের বিষাক্ত নিশ্বাস কলকাতার বাতাস ভারি করে তুলল। এত দিন শুধু দিনে দিনে জিনিসের দাম বাড়ার

মধ্যেই যুদ্ধের পরিচয় মিলছিল। আর খবরের কাগজের পাতায় আলাপে-আলোচনায়। তবু সে যুদ্ধ ছিল অনেক দূরে, তার অভিশাপ যতখানি, ভুল-চোখ বলত, আশীর্বাদও ততটাই। ধানের দাম বাড়ছিল, দেশের লোকের হাতে আসছিল টাকা। চাকুরে মানুষদের বরাতও যেন খুলে গিয়েছিল। বেকারদের চাকরি খুঁজতে হত না, চাকরিই খুঁজে বের করত বেকারদের। আর মাসে মাসে বেড়ে চলেছিল এ-ও-তা পাঁচ রকমের এলাওয়েন্স।

হ্যাঁ, এরই ফাঁকে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল বটে, দেশ-জোড়া কাঙালের ভিড় ভেঙে পড়েছিল শহর কলকাতার বুকে। কিন্তু নীলিমার দাদা তর্ক করেছে, বাবাও বলতেন, দুর্ভিক্ষ না কি যুদ্ধের জন্যে নয়। দুর্ভিক্ষ ভগবানের মার, কেউ রুখতে পারে না, বাবার কাছে বহুবার শুনেছে নীলিমা। আর দাদা বলেছে, দেশের লোকের বোকামিই না কি দুর্ভিক্ষের জন্যে দায়ী।

উঃ! সে সব দিনের কথা মনে পড়লেও ভয়ে শিউরে ওঠে নীলিমা। ফুটপাথে সারি সারি মড়া আর আধ-মরাদের রাশি, ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে হাঁটা যায় না নোংরা পচা খাবারের দুর্গন্ধে, ডাস্টবিন ঘিরে কুকুরের দলের মত ভুখাজানদের কামড়া-কামড়ি, লঙরখানার সামনে দেড় মাইল লম্বা কালো কালো কঙ্কালের লাইন, আর,—আর সকাল থেকে মাঝ রাত অবধি বাড়ীর আনাচে-কানাচে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-মরদদের 'ফ্যান দে মা' চিৎকারের বিরক্তি।

প্রথম প্রথম নীলিমাও বিরক্ত হত। মনে হত ঐ বুভুক্ষু মানুষগুলোই বুঝি বা সব শান্তি, সব স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে।

তার পর মানুষগুলো মরে ভূত হয়ে দুর্ভিক্ষের ছায়া সরিয়ে দিল শহরের বুক থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ছায়া নয়, সশব্দ বিষ-নিশ্বাস শোনা গেল পথে পথে।

অতিকায় হিংস্র জন্তুর মত বিরাট ট্রাক, লরী, ট্যাঙ্ক, এমকিবিয়া পিচের রাস্তা গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিল। কি ভয়ঙ্কর তার গর্জন, দম্ভিল চাকায় তার কি ভীষণ অট্টহাস!

নীলিমার মনে আছে। একদিন গভীর রাত্রিতে ঘুম-না-নামা চোখে জানালার গরাদ ধরে পথের দিকে তাকিয়েছিল নীলিমা। আর ওর চোখের সামনে দিয়ে সৈন্যবোঝাই ট্রাকের পর ট্রাক, ট্যাঙ্কের পর ট্যাঙ্ক স্তব্ধ স্তম্ভিত পৃথিবীর বুক বেয়ে সশব্দে গড়িয়ে গিয়েছিল। ব্ল্যাক আউটের রাতে যুদ্ধযানের সারিকে আসুরিক ছায়ার স্রোত মনে হয়েছিল। আর কি ভীষণ শব্দ তার, শান্ত নিস্তব্ধ রাতের বুকে কোন প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর উন্মত্ত হুঙ্কার যেন! যেন বেদনায় গুমরে-ওঠা পৃথিবীর মর্মকান্নার গোঙানি!

কত ভয়ে ভয়ে, আশঙ্কায় উত্তেজনায় পথ চলতে হত সেদিন। কপাটের এক পা বাইরে যেতেও বুক দুলে উঠত নীলিমার। মার্কিন আর ব্রিটিশ শ্বেতসৈনিকদের পৈশাচিক উল্লাস, আব পিশাচকায় নিগ্রো সৈনিকের অশ্লীল অট্টহাস!

তারপর। বিদ্রূপের হাসি হাসে নীলিমা আজও, তার পরেব ঘটনার কথা মনে পড়লেই। কিন্তু না, সুধাকান্তকে, দাদাকে ক্ষমা করেছে নীলিমা। দোষ দেয় না আজ তাকে। সত্যিই তো নিজের অন্তর দিয়েই তো মানুষ অপরকে বিচার করে।

প্রতিদিন দাদার কাছে যুদ্ধের গল্প শুনত নীলিমা। যুদ্ধেবই নয়, যোদ্ধারও। আব্রাহাম ম্যালিওনেস্কা আর স্টিফেন হিউজেস-- দু'জন মার্কিন সৈন্যের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সুধাকান্তর। আর খাস আমেরিকান সৈনিকদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার গর্বে মাটিতে পা পড়ত না সুধাকান্তর। কখনো আমেরিকা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, কখনো বা ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেসের ঘরেব খবর।

নীলিমা, নীলিমার বৌদি, আর বিধবা দিদি অণিমা সকলেই হাসাহাসি করত সুধাকান্তকে নিয়ে। পেছনে পকেট-লাগানো গ্যাবার্ডিন না কি যেন, তারই প্যান্ট পরতে শুরু করেছে তখন সুধাকান্ত। হাঁটা-চলায় হাবে-ভাবে পুরোদস্তুর আমেরিকান হবার বাসনা যেন। আর দাঁতে চিবিয়ে নাকিস্বুরে কথায় কথায় ইংরেজী বলার সে কি ধুম! এ নিয়ে কতবার যে ওরা হাসাহাসি করেছে!

বৌদি ঠাট্টা করে বলত, আমার বরাত মন্দ ঠাকুরঝি। দাদাটিকে তোমার ধরে রাখতে বোধ হয় পারলুম না। অমন মার্কিনের পাশে কি আর আমার মত লংক্লথকে মানায়, জর্জেট চাই।

দিদি অনেক ছোট বয়সে বিধবা হলে কি হবে, বেশ আমুদে, মুখে সব সময়েই হাসিহাসি ভাব, কথায় রসিকতা। সে বলত, তা মন্দ হয় না ভাই বৌদি, দাদার একটা বিলিতী বৌ এলে তবু মনের সুখে ইংরিজী বলতে পাব দু'টো। বাংলা বলতে বড় কষ্ট হয় আমাদের, কত ভেবে-চিন্তে কথা বলতে হয়।

নীলিমা যোগ দিত এ রসিকতায়; বলত, সত্যি, দিদি, কি মজা বল তো আমেরিকানদের, নাকিস্বুরে কথা বললেই ইংরেজী হয়ে বেরোয় কথাগুলো। ওরা এই সব বলাবলি করত, আর হেসে লুটিয়ে পড়ত এ ওর গায়ে।

সুধাকান্ত কিন্তু চটে যেত ওদের রসিকতায়। বলত, এই জন্যেই তো এ দেশের কিছু হল না। কারো ভাল দেখবার চোখ তো নেই আমাদের। জানিস আমেরিকার কুলি-মজুররা কত রোজগার করে? বিড়লার সমান।

কখনো বলত, আমেরিকা? স্বপ্নের দেশ, সোনার দেশ! ওখানে একটা লোকও বেকার নেই, কেউ হাজার টাকার নীচে

মাইনে পায় না। কত পয়সা ওদের, বিজনেসে অমন মাথা আর কারো নেই।

অণিমা হাসত।—তা ঠিক বলেছিস দাদা, ঐ যে এগারো টাকা দিয়ে সিগারেট লাইটারটা কিনলি, তিন দিন গেল না। অমন জোচ্চুরির মাথা অন্য জাতের সত্যি নেই।

সুধাকান্ত রেগে যেত।—যা জানিস না তা নিয়ে মাথা ঘামাস না, ওরা তিন দিনের বেশি কোন জিনিস ব্যবহার করে নাকি? সিনেমায় দেখবি, ওরা কাগজের গ্লাসে জল খায়, আর জল খেয়েই গ্লাসটা ফেলে দেয়।

নীলিমার বৌদি হেসে গড়িয়ে পড়ত এ কথায়। বলত, দেখ না, ওর বিয়েব সময় যে মাটিব গ্লাসে লোকজন খাওয়ানো হয়েছিল, সেগুলো তুলে রেখেছে নীলা ঠাকুরঝিব নিজের বিয়ের জন্যে।

ঠাট্টা বুঝতে পেরে চুপ করে যেত সুধাকান্ত। বলত, যাই বল তোমরা, ম্যালিওনেস্কার মত লোক হয় না। কি অমায়িক, কি বিনয়ী, আমাদের দেশের প্রাণ খুলে গুণগান করতে কিন্তু আব কাউকে দেখিনি। ও অবশ্য আসলে লিথুয়ানিয়ার লোক, ওর ঠাকুর্দার বাবা পালিয়েছিল আমেরিকায়, তখন থেকেই ওরা আমেরিকান হয়ে গেছে। ওর বাড়ীর সব ফটো দেখাল আমাকে, ওর বোন নাকি এবার সাঁতারে ফার্স্ট হয়েছে তাদের ক্লাবে।

নীলিমা ঠোঁট টিপে-টিপে হাসি চাপত।—তা হলে তাকেই বিয়ে কর না দাদা! বেশ মেমসাহেব বৌদি হবে আমাদেব।

বিরক্ত হয়ে উঠে যেত সুধাকান্ত, প্রতিজ্ঞা করত ওদের কাছে আর কোন দিন ওর আমেরিকান বন্ধুদের কথা তুলবে না।

কিন্তু না বলেও থাকতে পারত না সুধাকান্ত। কোন দিন হঠাৎ এসে বলত, জানিস অণি, হিউজেসের ফিয়াঁসে, ফিয়াঁসে

মানে বাগ্‌দত্তা, ভাবী বৌ আর কি, তার জন্যে ইণ্ডিয়ান গানের রেকর্ড পাঠালে হিউজেস। আমিও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটা রেকর্ড উপহার পাঠালাম।

তখন না বললেও, সুধাকান্তর অনুপস্থিতিতে ওরা তিন জন হাসাহাসি করেছে।—কি ভাষা ভাই, ফিয়াঁসে। দাদা যাই বলুক, আসল মানে কি জানিস তো দিদি? প্রেম করতে গিয়ে ফেঁসে গেলেই ফিয়াঁসে হয়।

তারপর।—আজ ধুতি পাঞ্জাবি আর চাদর পরে গিয়েছিলাম, ম্যালিওনেস্কা বললে, এমন কুল ড্রেস ও কোন দেশে দেখেনি।

কোন দিন।—রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড বাজিয়ে হিউজেসের ফিয়াঁসে লিখেছে, ইণ্ডিয়ান গানের মত সাবলাইম গান ও কখনো শোনেনি।

কখনও।—ম্যালিওনেস্কা বলছিল, বাঙালী মেয়েদের মত পোশাক-পরিচ্ছদে এমন চমৎকার টেস্ট কোন জাতের নেই।

এবং শেষে একদিন।—ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেস একদিন আমাদের বাড়ীতে ইণ্ডিয়ান ডিশ খেতে চায়, ইনভাইট করব? বলবি মাকে? বাবা রাগ করবেন না তো?

সুধাকান্তর কাছে শুনে শুনে লোক দু'টোর সম্বন্ধে ওদের সকলেরই মনে একটা ঔৎসুক্য জেগেছিল। কেমন চেহারা ওদের, ক ভাবে কথাবার্তা বলে, হাব-ভাবই বা কেমন। সত্যিই তো, কপাটের আড়াল থেকেই নয় দেখবে। যেচে নেমন্তন্ন চেয়েছে যখন, না বলা কি উচিত?

মা'র কাছে কথা পাড়লে সুধাকান্ত।—জান মা, ম্যালিওনেস্কার গলায় একটা ফিতেতে বাঁধা লকেট আছে, ওর মায়ের ছবি। ও রোজ ঘুমোবার আগে ওর মা'র প্যারালিসিস সারিয়ে দেবার জন্যে যেসাসের কাছে প্রার্থনা করে।

মা বললেন, আহা বেচারী! মা'রও কি কষ্ট বল তো বাবা! ছেলে জীবন হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে, এদিকে মায়ের হয়ত চোখে ঘুম নেই।

মা-ই বাবাকে বললেন, আহা সুধার বন্ধু, হলই বা সাহেব। মা-বাপ, ভাই-বোন, ঘর-সংসার ছেড়ে এত দূরে যুদ্ধ করতে এসেছে, দু'মুঠো ভাত খেতে চেয়েছে বন্ধুর বাড়ীতে, তাতে তোমার আপত্তি কিসের?

শেষ অবধি তাই মত দিতে হল।

আর হিউজেসের প্রথম আগমনের দিনটা বেশ স্পষ্ট মনে আছে নীলিমার। বিনয়ী লাজুক-লাজুক মুখ নিয়ে ম্যালিওনেস্কার পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকল ও, চৌকাটে হোঁচট খেল, কোথায় বসবে কি ভাবে কথা বলবে, ভেবেই যেন সন্ত্রস্ত নীলিমার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই চটি ছুঁয়ে প্রণাম করলে ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেস, হেসে বললে, আপনার ছেলে ইণ্ডিয়ান কাস্টম সব শিখিয়ে দিয়েছে আমাদের।

মা আড়াল থেকে চোখ মুছলেন, আর ওরা তিন ননদ-বৌদি মুখে আঁচল চেপে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

তারপর সহজ ভাবেই আসা-যাওয়া শুরু হল ওদের। নীলিমা দেখলে গায়ের রঙ ফর্সা হলেও, মুখে ইংরেজী বললেও লোকগুলো ভয় করবার মত নয়, অসুর নয়। খুব সহজ ভাবেই পরিবারের সকলের সঙ্গেই কেমন করে যেন মিশে গেল ওরা, বন্ধু হয়ে গেল। নীলিমা, নীলিমার বৌদি, এমন কি বিধবা দিদি অণিমাও ওদের সামনে চায়ের বাটি এগিয়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ করলে না।

আর লোক দু'টোর চোখেও তো কৈ কোন দিন অভদ্র ইশারা ধরা পড়েনি?

আশ্চর্য!

সেদিনটার কথা ভোলেনি নীলিমা, ভুলবে না। কিন্তু, কিন্তু সেদিনের কথা মনে পড়লেই যেন ভয়ে শিউরে ওঠে ও। একবার মনে পড়লে সারা রাত ঘুম আসে না ওর চোখে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুহূর্তের মধ্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। উষ্ণ আক্রোশে জ্বালা করে ওঠে চোখের কোণ দু'টো।

ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেসদের রেজিমেণ্ট পরের দিন ভোরেই নাকি বর্মার যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে চলে যাবে।

বিষণ্ণ বিষাদী মুখে ম্যালিওনেস্কা শুকনো হাসি হাসবার চেষ্টা করলে। নীলিমাকে বললে, মিস্, হয়তো ফিরতে পারব না আর। জীবনের মেয়াদ বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে।

হিউজেসের চোখও যেন ভিজে-ভিজে মনে হয়েছিল। ও সুধাকান্তকে বলেছিল, বন্ধু, এই ক্যামেরাটা তোমাকে উপহার দিলাম, তোমার একটা ছবি আমার বোনের কাছে পাঠিয়ে দিও এক মাসের মধ্যে কোন চিঠি না পেলে। লিখে দিও মৃত্যুর আগে অনেকগুলো শান্তির আর সুখের দিন হিউজেস যার সঙ্গে কাটিয়েছিল এ তারই ফটো।

মা আশীর্বাদের ইচ্ছায় হাত তুলে বললেন, ষাট, ষাট, যুদ্ধে যাচ্ছ, যুদ্ধ হয়ে গেলেই ফিরে আসবে; আমি আশীর্বাদ করছি। তোমার নিজের মা বেঁচে থাকলে যেমন ভাবে আশীর্বাদ করত, আমি তেমনি করেই আশীর্বাদ করছি বাবা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তোমরা দু'জনেই তোমাদের বাঙালী মায়ের কাছে সুস্থ শরীরে ফিরে আসবে।

ওদের মঙ্গল কামনায় পাঁচ সিকে পয়সা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে মা তুলে রেখেছিলেন মানত করে।

নীলিমার বিধবা দিদি অণিমা এত দিন হাসি-ঠাট্টা করেছে, কত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। কিন্তু সেদিন সেই শুচিশুভ্র থান কাপড়ের বৈধব্য

বেশ সবটুকুই যেন ব্যথায় বেদনায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল। এতটুকু হাসি দেখা দেয়নি তার মুখে ; একটা কথাও বলতে পারেনি অনেকক্ষণ। নীলিমাব মনে আছে, দিদির চোখ বেয়ে দর-দর করে জল গড়িয়ে পড়তে দেখেছিল সেদিন। কাঁপা-কাঁপা হাতে নমস্কার জানিয়েছিল, থর-থব করে ঠোঁট-জোড়াও কেঁপে উঠেছিল তার, কথা বলতে গিয়ে।

গাঢ গলায় বলেছিল, তোমাদের ছোট বোন আমি, আমি বলছি, তোমাদের কোন বিপদ হবে না। সুস্থ শবীরে দেশে ফিবে যাবে তোমবা, মা কালী, বক্ষাকালী তোমাদেব বাঁচাবেন। এই নাও, ভক্তি কবে এই মাদুলী দু'টো বেখে দাও, তোমাদেব কোন বিপদ হবে না।

ম্যালিওনেস্কা আব হিউজেস যখন বিদায় নিয়ে ফিরে গেল, নীলিমাব স্পষ্ট মনে আছে, দু'জনেব চোখেই দেখেছিল লুকানো অশ্রু।

—I wish she was my own mother, they were my own sisters

চোখ ছল-ছল কবে উঠেছিল ওদের দু'জনেবই, পবস্পবকে বলেছিল ঃ উনি যদি আমাব নিজেব মা হতেন, ওবা যদি আমাব নিজের বোন হতো!

সে রাত্রে ঘুম আসেনি নীলিমার চোখে, বহুক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়াব আতঙ্কে ভীতত্রস্ত দু'টি জীবনেব কথা বাব বার তাব চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

তারপর। তারপর মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতাকে উপহাস কবে অতিকায় জন্তুর মত বিবাট একটি ট্রাক ছায়া-ছায়া অন্ধকার ভেদ করে, শব্দেব হুঙ্কার তুলে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের বাড়ীর দরজায়। আর ট্রাকবোঝাই একরাশ সৈন্যের কালো কালো প্রেতছায়া

অট্টহাসে বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছে। সুরামত্ত মাতালের দল; শ্বেতসৈনিক আর নিগ্রো সৈন্যের দল চিৎকার করে, অর্থহীন গানের কলি আউড়ে, হৈ-হল্লা করে লাফিয়ে নেমেছে ট্রাক থেকে।

হেডলাইটের ঝকমক আলোয় নীলিমা চিনতে পেরেছে। ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেস কাঁধ-ধরাধরি করে টলতে টলতে এগিয়ে এসে ওদের বাড়ীর কপাট দেখিয়ে দিয়েছে দলবলকে। আর সৈন্যের দল কপাটের ওপর লাথির পর লাথি মেরেছে। কপাট ভেঙে পড়েছে সে আঘাতে।

ভয়ে, বিস্ময়ে, কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে নীলিমা, নীলিমার মা, বাবা, বৌদি, দিদি—সবাই। পালাবার কথা, লুকোবার কথাও তখন ভুলে গেছে ওরা। যখন মনে হয়েছে পালানো উচিত, লুকানো উচিত, তার আগেই মদের গন্ধে সারা ঘর ভরে গেছে। প্রেতের মত অশুভ ছায়া-শরীর ওদের ঘিরে ফেলেছে তখন। বাবা আর দাদা ছুটে গেছে বাধা দেবার জন্যে। ঐ দানব-শরীরের কাছে ওরা আর কতটুকু? বন্দুকের বাঁটের একটা ঘা কে যেন বসিয়ে দিয়েছে দাদার মাথায়, অজ্ঞান হয়ে ছিটকে পড়েছে দাদা। নিস্তব্ধ রাতের বুকে হঠাৎ একটা পিস্তলের গুলির শব্দ। চিৎকার করে যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে নিশ্চুপ হয়ে গেছেন নীলিমার বাবা। ছোট ভাই শুভকান্ত কেঁদে উঠেছে সশব্দে, ভয়ে নীলিমার পা জড়িয়ে ধরেছে।

তার পর, তার পর ম্যালিওনেস্কা এগিয়ে এসেছে টলতে টলতে। নীলিমার চোখের সামনে। একটা ক্ষুধার্ত পশুর মত···

থপ-থপ করে এগিয়ে এসেছে হিউজেস, সে কি ভীষণ ভয়াল চোখ ·

বৌদির একটা কান্না চিৎকার স্তব্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ।

আর নীলিমা···কতক্ষণই বা ওর জ্ঞান ছিল? তবু যতক্ষণ

জ্ঞান ছিল, নীলিমার শুধু মনে পড়ে, একটার পর একটা প্রেতের ছায়া এগিয়ে এসে ওকে গ্রাস করেছে।

একটা পুরো দিন অজ্ঞান হয়ে ছিল নীলিমা। জ্ঞান হয়ে দেখল ডাক্তার, পাড়াপড়শীদের অনেকে ভিড় করে এসেছে। লজ্জায় চোখ বুজলে নীলিমা।

কিন্তু কত দিন আর চোখ বুজে থাকা যায়? পিস্তলের গুলীতে বাবা মারা গেলেন। মা আত্মহত্যা করলেন। বৌদি অন্তঃসত্ত্বা ছিল, আঘাতের ফলে এক মাস ধরে অসুখে ভুগে মারা গেল। বিধবা দিদি হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল একদিন, উনুন ধরাতে গিয়ে সারা গায়ে ছাই মাখতে শুরু করলে। তার পর কোন্ ফাঁকে কপাট খোলা পেয়ে কোথায় যে চলে গেল, খোঁজ মিলল না।

সুস্থ শরীরে শুধু বেঁচে রইল নীলিমা, সুধাকান্ত আর শুভকান্ত। চুপচাপ, উদাস, উদ্‌ভ্রান্ত। কারো সঙ্গে একটা কথাও বলত না সুধাকান্ত। এক মিনিটের জন্যেও বাইরে যেত না। শুধু অন্যমনস্ক ভাবে বসে থাকত সদা-সর্বদা। তারপর মাস দু'য়েকের মধ্যে নীলিমার বিয়ের ব্যবস্থা করল সুধা। আর বিয়ের পরদিনই খবর পাওয়া গেল একটা মিলিটারী ট্রাকে চাপা পড়ে সুধাকান্ত মারা গেছে। সে খবর শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল নীলিমা। কোন কথা বলেনি! আনন্দের আবেগ বুনে বাসর কাটায়নি ও, পর-পর এতগুলো মনভাঙা দুর্ঘটনা, এত বড় একটা ঝড় সহ্য করে কেউ সিঁথি-সিঁদুরের রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারে? বিষণ্ণ ব্যথার মধ্যেই সেদিন ও নিজেকে সমর্পণ করেছিল মৃন্ময়ের কাছে, মন্ত্রপাঠের সময় মৃন্ময়ের হাতের মধ্যে ওর হাতখানা কেঁপে উঠেছিল বার বার। মৃন্ময় ভেবেছিল, ভয়। ওর চোখের বেদনাশ্রু দেখে ভেবেছিল, এ বুঝি শৈশবের

স্মৃতিতে গড়া মায়ামুগ্ধ ঘর ছেড়ে অনির্দেশে পা দেয়ার ব্যথায় সজল।

মৃন্ময় জানত না।

নীলিমার চোখে জল বয়েছিল একটি আকস্মিকতার অভিশাপকে স্মরণ করে, নীলিমার ভয়-ভীরু হাত কেঁপেছিল গোপন আত্ম-গ্লানিতে, জীবনের লুকিয়ে-রাখা একটি আত্মধিক্কারের অধ্যায়কে স্মরণ করে।

তার পরের দিন রাত্রেই সঠিক খবর এল, নীলিমা যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটে গেছে। মিলিটারী ট্রাক চাপা পড়ে মারা গেছে সুধাকান্ত। কে যেন বললে, আজ-কাল হামেশাই তো হচ্ছে, একটু দেখে-শুনে না চললেই···

কেউ গালাগালি দিলে, মিলিটারীর উদ্দেশে, বিদেশী সৈনিক-দের উদ্দেশে।

নীলিমার মন বললে অন্য কথা। দীর্ঘ কয়েকটী মাস প্রতি মুহূর্তে যে কারণে সশঙ্কিত থাকত নীলিমা, সামান্য শব্দে চমকে চমকে উঠত যে ভয়ে, একটা মিনিট সুধাকান্ত চোখের আড়াল হলে যে আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠত ওর, তাই ঘটে গেল। নীলিমা বুঝতে পারলে, কেন এই দীর্ঘদিন ধরে একটিও অতিরিক্ত কথা না বলে, লোকালয় থেকে মুখ লুকিয়ে ঘরের কোণে নিঃসঙ্গ নিশ্চুপ দিনগুলো কাটিয়ে এসেছে সুধাকান্ত! কেন কর্তব্য শেষ করার পর একটা সম্পুর্ণ দিনও বেঁচে থাকবার সাধ জাগল না সুধাকান্তর?

নিজেকে অত্যন্ত ভীরু, অত্যন্ত অপরাধী মনে হল নীলিমার। যে লজ্জায়, যে গ্লানির অসহ্য জ্বালায় সকলেই পৃথিবী থেকে পালাবার পথ খুঁজল, সেই গ্লানি, সে লজ্জা লুকিয়ে রেখে নতুন করে বাঁচবার এ কি দুঃসহ আশা তার!

তবু সব ক্লেদ ধুয়ে-মুছে গেল একদিন। মৃন্ময়ের আদরে সোহাগে মনে হল, আকাশে এখনো চাঁদ ওঠে, মেঘ এখনো রামধনু আঁকে নতুন নতুন। অতীতের নোংরা কপাট চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে আবার জীবন শুরু করতে চাইলে নীলিমা।

কিন্তু, যে পথেই হাঁটতে গেছে নীলিমা একটা মস্ত বড় 'কিন্তু' এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

মৃন্ময়ের সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাস-ভরা রঙিন পাখনা থেকে শিশিরের মত তাকে ঝরে পড়তে হয়েছে এই নোংরা না-আলো না-বাতাস অন্ধ গলির দুর্গন্ধময় ছোট্ট ঘরখানিতে। অভাব, দারিদ্র্য, রোগ-শোক। প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর পথ চেয়ে অপেক্ষা করা। অসহায় দুঃখে মৃন্ময়ের চোখে-জল-ঝরানো কষ্টসহিষ্ণুতা, ক্লান্তিতে ভেঙে-পড়া শরীর নিয়ে রাত জেগে জেগে মৃণ্ময়ের বুকে হাত বুলিয়ে স্বস্তি দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা।

ব্যর্থ ই।

ভোর হবার অনেক আগে, অন্ধকার ফিকে হওয়ার আগেই আবার কাশির দমকে-দমকে রক্ত উঠতে শুরু হল। অসহ্য কষ্টে বুকে হাত চেপে বার কয়েক কাশে মৃন্ময়, আর তার পরই পিক-দানিতে ফিনকি দিয়ে কালো কালো রক্ত পড়ে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবলে নীলিমা। কি করবে ও, কি করা উচিত?

তারপর ধীরে ধীরে পাশের ঘরে নিদ্রিত সানুকে ডেকে তুললে।

—ঠাকুরপো, ডাক্তার বাবুর কাছে যাও একবার, যেমন করে পার হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে এস একবার।

দাদার মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত আশঙ্কায় তাকিয়ে দেখল

সান্থ, তারপর ছুটে চলে গেল। বলে গেল, কিছু ভেবো না বৌদি, আমি এক্ষুনি ডেকে আনছি।

মৃন্ময় শুধু বিষণ্ণ চোখে তাকালে নীলিমার দিকে, ইশারায় পাশে বসতে অনুরোধ জানালে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, মিথ্যে চেষ্টা নীলিমা, আমি বুঝতে পারছি।

নীলিমা কি যেন একটা বলতে গেল, মৃন্ময় বাধা দিল। বললে, শোন, একটা কথা তোমাকে বলব বলেও কোন দিন বলতে পারিনি, একটা অপরাধ আমি স্বীকার করে যেতে চাই নীলিমা। জানি, সে অপরাধ তুমি ক্ষমা করতে পারবে না কোন দিন, তবু আমি তো শান্তি পাব।

নীলিমা বললে, চুপ কর লক্ষ্মীটি, চুপ কর তুমি। ডাক্তার বাবু এলেই তুমি সেরে উঠবে, আমি বলছি, তুমি সেরে উঠবে। এর আগেও তো কতবার এমন হয়েছে, কেন ভয় পাচ্ছ তুমি? কথা বলো না, চুপ করে থাক একটু।

মৃন্ময় হাসলে।—এর আগে তো কখনো মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখতে পাইনি নীলিমা, বুঝতে পারিনি। এবার যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নীলিমা, বলতে দাও, একটা কথা আমাকে বলতে দাও।

নীলিমা চুপ করে রইল, কোন বাধা দিল না, কোন কথা বললে না। একদৃষ্টে শুধু তাকিয়ে রইল, আর ওর ছ'চোখ বেয়ে দর-দর করে জল গড়িয়ে পড়ল নিঃশব্দে।

—তোমার ওপর আমি···লজ্জায় আত্মগ্লানিতে সমস্ত মুখ যেন সাদা হয়ে গেল মৃন্ময়ের, বললে, আমি যে অপরাধ করেছি তার ক্ষমা নেই নীলিমা! আমি, আমি আমার অসুখ লুকিয়ে রেখে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম।

বিস্ময়ে চমকে উঠল নীলিমা, মৃন্ময়ের মুখের দিকে দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকাল।

—হ্যাঁ, নীলিমা! হঠাৎ একদিন কাশতে কাশতে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরুল থুতুর সঙ্গে। ভয়ে শিউরে উঠলাম আমি, সমস্ত দিন, সমস্ত রাত মনে হল, আমি যেন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছি। মনকে বোঝাতে চাইলাম, হয়ত গলায় ঘা, নয়ত দাঁতের গোড়া থেকে পড়েছে। পরের দিন, তার পরের দিনও রক্ত পড়ল দু' ফোঁটা করে, ভোরের দিকে। খাওয়া-দাওয়া ভাল করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ডাক্তার দেখাতে সাহস পেলাম না। সত্যিই যদি এ রোগ হয়ে থাকে, ডাক্তার হয়ত সারাতে পারে। কিন্তু অত টাকা কোথায় আমার? আর, আর সেরে যাবার পর কি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলে ফিরে নেবে আমাকে? কিন্তু তার চেয়েও বড় দুঃখ কি ছিল জান নীলিমা!

নীলিমা শুনছিল ওর কথা, একমনে। হয়ত সব কথা ভাল করে বুঝতেও পারছিল না। হঠাৎ ভেঙে পড়ল মৃন্ময়ের বুকের উপর।—আগে বলনি কেন, বিয়ের পরই কেন বলনি তুমি আমাকে? তা হলে এত দেরি হত না, হয়ত সেরে উঠতে তুমি। আমি ত ছিলাম, আমি ত তোমাকে ছেড়ে যেতাম না? কেন বলনি তুমি, কেন?

মৃন্ময় হাসল। বললে, বুঝবে না নীলিমা, তুমি বুঝতে পারবে না। দিনে দিনে ওজন কমে যাচ্ছে দেখলাম, প্রতিদিন জ্বর হচ্ছে বুঝতে পারতাম। আর কেবল ভয় হত। ভাবতাম, এমনি ভাবে জীবনে কোন ভালবাসা না পেয়ে, কোন মেয়ের স্পর্শ না পেয়ে, অনুতাপ অনুভব না করে মৃত্যু হওয়ার চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর নেই। তাই অসুখ গোপন রেখে তোমাকে বিয়ে করলাম, আর বিয়ের পরও তোমার সঙ্গ পাবার জন্যে, তোমাকে হারাবার

ভয়ে কোন দিন বলতে সাহস পাইনি। আজ তোমাকে হারাবার ভয় নেই বলেই দূরে সরে থাকতে বলি, সেদিন পারতাম না।

নীলিমার চোখের জলে জামা ভিজে গেল মৃন্ময়ের। কান্নাচাপা গলায় নীলিমা বললে, ছিঃ ছিঃ, এমনি করে নিজের সর্বনাশ করে, ভেতরে ভেতরে এমনি করে রোগ বাড়িয়েছ তুমি ?

মৃন্ময় হাসলে, ব্যথাহত হাসি। সেদিন রোগকে ভয় ছিল না আমার, মৃত্যুকে ভয় ছিল না। শুধু মনে হয়েছিল, মৃত্যু যখন আসছেই, জীবনকে ভোগ করে নেই। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায় নীলিমা!

'মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায় নীলিমা!' কথাটা আবার নতুন করে মনে পড়ল নীলিমার।

মৃন্ময় আবার কিছুটা সুস্থ হল, ডাক্তার মত দিল, হয়ত এ যাত্রাটা কোন রকমে কেটে যাবে। খরচ করে ভাল ভাবে চিকিৎসা করলে এখনো হয়ত বাঁচান যেতে পারে মৃন্ময়কে। কিন্তু নীলিমার কানে এ সব কথা পৌঁছল না। জানালার ধারে বসে বাইরের ছোট্ট এক ফালি আকাশের দিকে তাকিয়ে নীলিমা শুধু ভাবলে, 'মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায়!'

মিথ্যে নয় তা হলে, অপরাধ স্ক্ষালনের মিথ্যা ভণিতা নয়! আব্রাহাম ম্যালিওনেস্কা আর স্টিফেন হিউজেস! দু'জনের কথা মনে পড়ল নীলিমার। মনে পড়ল সেই চিঠির কথা।

বহু দিন আগে হঠাৎ বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির হয়েছিল নীলিমা ওদের সেই পুরোন ফ্ল্যাটে। নতুন বাসিন্দেদের বলেছিল, ঘুরে ঘুরে বাড়াটা একবার দেখব, এখানে আমরা ছিলাম কিনা এক সময়।

গৃহকর্ত্রী তখন আদর-আপ্যায়ন করে বসিয়েছিলেন ওকে, এনে দিয়েছিলেন একখানা চিঠি।—এ চিঠি কি আপনাদের, অনেক দিন

থেকে পড়ে আছে, বুঝতে পারিনি বলে খুলেছিলাম, কিছু মনে করবেন না।

চিঠিটা নিয়ে চলে এসেছিল নীলিমা। দাদার চিঠি, সুধাকান্তর নাম—ঠিকানার ঘরে। কিন্তু কে লিখেছে এ চিঠি? উল্টে-পাল্টে দেখেছিল ও, যুদ্ধ-ফ্রন্টের অগুন্তি সেন্সারের ছাপ, নম্বর, তার ওপর এখানকার ডাকঘরের সীলমোহর।

চিঠিটা পড়েছিল নীলিমা। নাম সই ছিল না, কিন্তু নীলিমা বুঝতে পেরেছিল, এ চিঠি সেই দু'টো অসুরের কোন একজনের লেখা। ক্ষমা চেয়েছিল সে সুধাকান্তর কাছে, লিখেছিল, "বন্ধু, তুমি জান না, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হলে মানুষ কতখানি অমানুষ হয়ে যায়। আমাকে তোমরা হয়ত শয়তান ভাব, কিন্তু আসল শয়তান এই যুদ্ধ। নিজেদের মনুষ্যত্ব আমরা এই ডেভিলের কাছে বিক্রি করে দিয়েছি, তাই, আমরাও এক-একটি ক্ষুদে শয়তান হয়ে দাঁড়িয়েছি এই বিরাট শয়তানটার দাপটে। তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। সে রাত্রে প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর, আর এই ওয়ার-ফ্রন্টেও কতবার ইচ্ছে হয়েছে সুইসাইড করে আমার অপরাধের গ্লানি মুছে ফেলি। কিন্তু পারিনি, আমি ভীতু, কাপুরুষ। জীবনকে আমি বড় বেশি করে ভালবাসি। মৃত্যুর. মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ জীবনকে আরো বেশি করে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তোমার মায়ের আশীর্ব্বাদ, তোমার সেই বিধবা দিদির প্রার্থনা যদি এতদিনে অভিশাপে পরিণত হয়ে না থাকে, তাহলে হয়ত সত্যিই দেশে ফিরে যেতে পারব আমি জীবন নিয়ে। আজ রাত্রেই আমাদের জাহাজ ছাড়বে, দেশে ফিরে যাব আমরা। আত্মহত্যা করার সাহস পাইনি আমি সত্যিই, কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে কোন দিন এই বড় শয়তানটাকে জাগতে দেব না আমি। ভেবে দেখো, হয়ত চেষ্টা

করলে আমাকে ক্ষমা করতে পারবে তুমি, হয়ত পারবে না, কিন্তু যুদ্ধকে কোন দিন ক্ষমা করো না ভাই।"

এ চিঠি পড়ে সেদিন ক্রোধে-আক্রোশে সারা শরীরে জ্বালা অনুভব করেছিল নীলিমা, দাঁতে দাঁত চেপে এমন ভাবে চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলে দিয়েছিল, যেন সেই পৈশাচিক মানুষ দু'টোর শরীর ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলছে সে। অদ্ভুত এক আনন্দে, অসহ্য এক দুঃখে সারা রাত্রি তার চোখে ঘুম আসেনি সেদিন।

তারপর, দিনে দিনে সব বেদনা, সব আক্রোশ স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। মন বলেছিল—আমরাও এক একটি ক্ষুদ্র শয়তান হয়ে দাঁড়িয়েছি এই বিরাট শয়তানটার দাপটে!

মনে পড়ছিল,—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায় নীলিমা!

মৃন্ময়ের পায়ের কাছে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে একমনে ভাবছিল নীলিমা, মনে পড়ছিল···

এমন সময় হঠাৎ রুনি এসে দাঁড়াল তার সামনে। চুপচাপ, চোখে চোখ পড়তেই কি যেন বলতে গিয়ে লজ্জায় চুপ করে গেল। তারপর অনেক চেষ্টা করেই যেন বললে, মা, অভিদা'র বড়দা এসেছেন, বড় ডাক্তার নিয়ে এসেছেন।

চমকে ধড়মড় করে উঠে পড়ল নীলিমা। দেখল অভিজিৎ, অভিজিতের দাদা, আর বৃদ্ধ, কুব্জদেহ একটি দীর্ঘ শরীরের সৌম্যবিস্তৃত একজোড়া চোখ। মুখে বার্ধ্যক্যের হাসি।

নীলিমার মাথায় হাত দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, ভয় কি মা, সব সেরে যাবে।

তারপর মৃন্ময়কে ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন, এঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে মা, এখানে ত হবে না।

নীলিমা কেঁদে ওঠে !—না, না, হাসপাতালে না।

বৃদ্ধ হাসেন ধীরে ধীরে।—এ এক যুদ্ধ মা, এর নাম জীবনযুদ্ধ। মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে হলেও তো অনেক সৈন্যসামন্ত গোলাবারুদ দরকার হয়। একা একা এখানে পারবে কেন ?

—কিন্তু, কিন্তু অত টাকা ত আমার নেই ? না, না, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে না, আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পাবেন না।

বৃদ্ধ ডাক্তার আবার নীলিমার মাথায় হাত রাখেন।—তুমিই বরং ওর কাছে চল না মা, তুমিও আমাদেরই একজন হও না ? আমরা সবাই তোমার স্বামীর জন্যে যুদ্ধ কবব, আর তুমিও, শুধু তোমার স্বামীর জন্যে নয়, সকলের জন্যে যুদ্ধ করবে। সেবা দিয়ে সাহস দিয়ে আরো অনেককে সারিয়ে তুলবে তুমি।

উৎসাহে আনন্দে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকায় নীলিমা।—পারব, পারব আমি ? আমি যে কিছু জানি না।

সস্মিত হাসিতে মুখ ভরে যায় বৃদ্ধের। বলেন, যে একা একা এত বড় যুদ্ধ চালিয়ে এল, সকলের সঙ্গে এক হয়ে সে লড়তে পারবে না ? পারবে মা, পারবে।

নীলিমা তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে এর পর। ওর মন বললে, যুদ্ধকে আমি ভয় পাই না। যুদ্ধ চাই, আমিও যুদ্ধ চাই।

নিকুঞ্জ লাহিড়ী

নিকুঞ্জ লাহিড়ীকে আপনারাও হয়ত কখনও না কখনও দেখে থাকবেন। বছর পাঁচেক আগেও ধর্মতলার ওপর একটা ডাক-টিকিটের দোকান ছিল নিকুঞ্জর। লাল রঙের বড় একটা সাইনবোর্ডে ইংরাজীতে লেখা ছিল 'স্ট্যাম্প এক্সচেঞ্জ', নীচে ছোট হরফে: প্রোপ্রাইটর—এন, লাহিড়ী, ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড্ ফিলাটেলিস্ট।

পুরোন ডাকটিকিটের ব্যবসায়ে যে নিকুঞ্জ একদিন বড় হবে, নাম কিনবে, তা আমার অনেক আগে থেকেই বোঝা উচিত ছিল।

একবার কোন একটা বিদেশী পত্রিকায় নিকুঞ্জর ছবি বেরিয়েছিল। আমি তখন জাহাজে চাকরি করি। জাহাজে চাকরি বলতে অবশ্য নাবিক ভাববেন না, সিন্দবাদের বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চার ঘটবার মত সমুদ্রযাত্রা কোনদিন করতে হয়নি আমার জাহাজী জীবনে। আমাদের কোম্পানীর জাহাজ বিশাখাপত্তন থেকে কলম্বো যেত আর কলম্বো থেকে ফিরে এসে আমরা তাঁবু ফেলতাম ডলফিন্স্ নোজে। কাজ ছিল খালাসীদের মাইনে দেয়া, আর দৈনন্দিন র‍্যাশনের হিসেব রাখা। তা হোক, আজকের তুলনায় তখন অবসর ছিল প্রচুর। আর সে অবসর কাটাতে হত, কখনও রেডিও খুলে, কখনও ডেকের ওপর টেবল্‌টেনিসের জাল এঁটে, আর বাকি সময়টা স্রেফ বিলাতী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে।

কেবিনঘরে শুয়ে শুয়ে কোন একটা কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ সেদিন চমকে উঠেছিলাম। ছবির নীচে নামটা

দেখে আরও বেশি। এন, লাহাড়ী যে নিকুঞ্জ লাহিড়ী তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি এতটুকু।

বিস্মিত কম হইনি। আমাদের নিকুঞ্জ কি না পৃথিবীর মধ্যে একজন নামকরা ডাকটিকিটওয়ালা। কয়েকটা বিশেষ ধরনের পুরোন ডাকটিকিট সংগ্রহ করে নিকুঞ্জ তখন রাতারাতি বিখ্যাত।

ডাকটিকিট পুরোন হলে যে তার দাম বাড়ে, আর সেই পুরোন ডাকটিকিটের যে আবার ব্যবসা আছে, তখন সে সম্পর্কে অস্পষ্ট একটা ধারণা মাত্র ছিল। আর তাও নিকুঞ্জর কাছ থেকেই শোনা।

খুব ছোটবেলাকার একটা ঘটনা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তখন ইস্কুলে পড়ি।

দুপুরের গরমে ঘামতে ঘামতে পরীক্ষার পড়া তৈরী করছি, হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে উঠে এসে দরজা খুললাম। দরজা খুলে দেখি, পিওন এসেছে চিঠি বিলি করতে।

চিঠিটা সবে হাতে নিয়েছি, পিওনের পিছন থেকে কে বলে উঠল, টিকিটটা আমাকে দেবে ভাই?

তাকিয়ে দেখি আমারই বয়েসী ফুটফুটে একটি ফর্সা ছেলে। তখনও হাঁফাচ্ছে, আর রোদে লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ।

বললাম, টিকিট? কিন্তু চিঠি তো আমার নয়, দাদার নামে।

পিওন বললে, তা হোক্ খোকাবাবু, টিকিটটা তুলে ওকে দাও, বেচারা এক মাইল ছুটতে ছুটতে আসছে আমার পিছনে পিছনে।

টিকিটটা দেয়ার পর আলাপ হয়ে গিয়েছিল নিকুঞ্জর সঙ্গে। বলেছিল, সুইডেনের টিকিট আমার একটাও নেই। ভাগ্যিস তুমি দিলে।

শুধু সুইডেন নয়, পৃথিবীর সব জায়গার টিকিটের ওপরই ছিল ওর সমান লোভ। সকালে যখন পোস্ট অপিসে ডাক আসত,

তখন নিকুঞ্জকে দেখতে পেতাম ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ডাকঘরের সামনে। তারপর পিওনদের কাছে জিগ্যেস করে জেনে নিত কোন বিদেশী চিঠি আছে কি না। ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়রদের নামে প্রায়ই দু'চারখানা চিঠি থাকত। আর নিকুঞ্জ তাই পিওনের সঙ্গে সঙ্গে দু'তিন মাইল হেঁটে চিঠির মালিকের কাছ থেকে টিকিটটা চেয়ে আনত।

ডাকটিকিটের গল্প যত না শুনতাম ওর কাছে তার চেয়ে বেশি বিস্ময় জাগতো ওর সাধারণ জ্ঞান দেখে। কোথায় কোন দেশ, কেন স্ট্যাম্পে গ্রীসের রাণীর মুখ সরে গিয়ে মশালের ছবি হয়েছে, কিংবা ডাকটিকিটে যে দ্য ভিঞ্চির ছবি ছাপা হত, দ্য ভিঞ্চি নিজে তার চেয়ে কত ভাল ছবি আঁকত, এসব তথ্য ছিল ওর কণ্ঠস্থ।

আমি যেবার ম্যাট্রিক পাশ করলাম, নিকুঞ্জর বাবা সেই বছরেই দিল্লীতে বদলি হয়ে চলে গেলেন। তারপর বহুদিন ওর কোন খোঁজখবরই পাইনি। আর পাবই বা কি করে! ও চলে গেল দিল্লী, আমরা চলে গেলাম ব্যাঙ্গালোরে।

তারপর পড়াশুনোর অসুবিধে হত বলে আমি এসে উঠলাম হোস্টেলে। দিন কয়েক পরেই আমার ঘরের অন্য খাটে দেখি একরাশ বাক্স বেডিং।

হাত মুখ ধুয়ে যে এসে ঢুকল, তাকে প্রথমে চিনতেই পারিনি। এই ক'বছরের মধ্যে নিকুঞ্জ যে এতখানি বদলে যাবে ভাবতেই পারিনি। যেমন লম্বাচওড়া চেহারা হয়েছে, তেমনি মুখচোখে কথার খৈ ফুটছে। ছোটবেলাকার সেই লাজুক লাজুক ভাব কোথায় চলে গেছে।

আলাপ পরিচয়ের পর যখন দু'জনে দু'জনকে চিনতে পারলাম, নিকুঞ্জ বললে, সে ডাকটিকিটের এলবামটা কিন্তু দান করে দিয়েছি।

—দান করে দিয়েছ? বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করলাম, কাকে?

লজ্জিত হাসি হেসে নিকুঞ্জ বললে, একটি মেয়েকে।

বললাম, দান নয় তা হলে, উপহার বল।

নিকুঞ্জ কৌতুকে হাসল। বললে, উপহারও নয়, বল স্মৃতিচিহ্ন।

তারপর দিনে দিনে একটু একটু করে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারলাম। দিল্লীতে গিয়েও নাকি নেশা ছাড়েনি ওর। সেখানেও পিওনের পিছনে পিছনে ছুটত। আর এইভাবে ডাকটিকিট চেয়ে আনতে গিয়েই মালার সঙ্গে আলাপ হয় তার। তারপর দু'জনেরই আগ্রহ বেড়েছে ডাকটিকিট জোগাড় করার, আর সঙ্গে সঙ্গে বয়স। ফলে যা হয়, দু'জনেই একদিন আবিষ্কার করেছে, ডাকটিকিট আসলে উপলক্ষ মাত্র।

নিকুঞ্জ হেসে বললে, এলবামটা দিয়ে দিলাম মালাকে। চিরকাল অপরের চিঠি থেকে ডাকটিকিট তুলে নিয়েই জীবন কাটালাম, নিজে চিঠি লেখার সুযোগ পেলাম না কোনদিন।

বললাম, এবার তো সে সুযোগ ঘটেছে।

সুযোগ বলে সুযোগ। প্রতি হপ্তায় মালাকে চিঠি লিখত নিকুঞ্জ, আর উত্তর এলেই পড়ে শোনাত আমাকে।

নিকুঞ্জ উপন্যাসের পাতা থেকে নকল করে অনেক ভাল ভাল কথা লিখত, কবিতাও। কিন্তু উত্তর আসত শুধু ডাকটিকিট আর ডাকটিকিট।

ডাকটিকিট সম্পর্কে যেটুকু জ্ঞান হয়েছিল নিকুঞ্জর কথা শুনে, মালার চিঠি পড়ে তার চেয়ে বেশি শিখেছিলাম। কিন্তু নিকুঞ্জর কোন উৎসাহ দেখতাম না এদিকে। ও তখন রীতিমত রাজনীতি করছে।

তখন পিকেটিং, অসহযোগ, বন্দেমাতরমের যুগ।

হঠাৎ একদিন খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরতে দেখলাম নিকুঞ্জকে, আর দিনকয়েক পরেই ও বললে, চললাম দেশ স্বাধীন করতে।

নিকুঞ্জর বাবা প্রথমে ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তারপর জেলার ভারও পেয়েছিলেন। তিনি এসে গরম গরম কথা শোনালেন সুপারিনটেণ্ডেন্টকে।

বললেন, আপনাদের দোষেই ছেলে আমার বয়ে গেছে।

তারপর থানায় নিকুঞ্জর সঙ্গে দেখা করে বললেন, আর কখনও এ-পথে আসবে না, বণ্ড লিখে দাও, ছাড়া পাবার ব্যবস্থা করছি।

নিকুঞ্জ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, কভি নেহি।

আর আমরাও শুনলাম, নিকুঞ্জর বাবা নিকুঞ্জকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, ও ছেলের আর মুখ দেখবেন না।

যথারীতি সকলের সঙ্গে নিকুঞ্জও অবশ্য ছাড়া পেল মাসকয়েক পরে, আবার হোস্টেলে ফিরে এল ও।

কিন্তু নিকুঞ্জর বাবা তখন ছেলের জন্যে একটা পয়সাও খরচ করতে রাজি ন'ন। যে ছেলে আজ রাজার আইন মানতে চায় না, দু'দিন পরে সে বাপকেও মানতে চাইবে না।

দু'দিন পরে কেন, তাঁর কথা শুনে বণ্ড লিখে দিতেও তো রাজি হয়নি নিকুঞ্জ।

নিকুঞ্জ কলেজে তার নাম রাখবে কি রাখবে না ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন আমাদের হোস্টেলে যে মেয়েটি এসে হাজির হল, কে জানত সেই মালা সেন।

নিকুঞ্জর কাছে মালার গল্প শুনে শুনে, আর মালার সুন্দর ছাঁদে লেখা চিঠি পড়ে যে চেহারাটা কল্পনার চোখে গড়ে তুলেছিলাম, তার সঙ্গে মিল নেই এতটুকু।

ছিমছাম দোহারা গড়ন, সাজসজ্জায় একটু বেশি রকম উগ্র, নাকটা একটু বা চাপা। গায়ের রঙও ময়লা।

নিকুঞ্জই আলাপ করিয়ে দিল মালার সঙ্গে। আর নিকুঞ্জর অনুপস্থিতিতে মালা একসময় তার ঠিকানাটা দিয়ে বললে, ওঁর যখন যা টাকার দরকার হবে আমাকে লিখবেন।

আর সত্যি কথা বলতে কি, পুরো এক বছর, কলেজের মাইনে অবশ্য লাগত না ওর, কিন্তু হোস্টেলের সব খরচ জুগিয়েছিল মালা। অর্থাৎ মালার ডাক্তার বাবা।

তারপর পরীক্ষার ফল বের হল। দেখলাম, নিকুঞ্জ স্কলারশিপ পেয়েছে। ভেবেছিলাম বিএ-তে অনার্স নেবে ও।

কোথায় কি, নিকুঞ্জ হঠাৎ একটা মোটরের গ্যারেজে মেকানিকের চাকরি নিল।

রীতিমত কালিঝুলি মেখে ঠুকঠাক হাতুড়ি পেটার কাজ।

মালা চিঠির পর চিঠি লিখল, নিজেও এসে হাজির হল, কিন্তু কোন কাজ হল না।

আমারও ব্যাপারটা ভাল লাগেনি। তাই একদিন চলে গেলাম নিকুঞ্জর বাবার কাছে।

নিকুঞ্জর মা খুব কান্নাকাটি করলেন, ছেলেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে।

নিকুঞ্জর বাবার চোখও ছলছল করল, বললেন, ও যদি ফিরে এসে পড়াশুনা করে, আমি কোন বাধা দেব না। টাকা আগেকার মতই দেব আমি।

নিকুঞ্জ সব শুনে বললে, উঁহু। সুবোধ বালকের মত বাড়িতে ফিরে যেতে রাজি আছি, বাবা যদি এক মাসের মধ্যে বিয়ে দেয়, আমি বিয়ে করব।

হেসে ফেললাম ওর কথা শুনে। এমন দুর্ধর্ষ ছেলে, তার মুখে এমন শান্তশিষ্ট কথা

বললাম কাকে ?

নিকুঞ্জ বললে, না মালা নয়। বাবা মা যেখানে বলবে। কিন্তু এক মাসের মধ্যে।

শুনে নিকুঞ্জর বাবাও হাসলেন, আর আমরা বন্ধুবান্ধবরা হাসা-হাসি করলাম নিকুঞ্জর পাগলামি দেখে।

খবর বোধ হয় মালার কাছেও পৌঁছে গেল। সাত পাতার একখানা লম্বা চিঠি এল তার কাছ থেকে।

খামটা না খুলেই নিকুঞ্জ বললে, দেখত পড়ে, কি লিখেছে।

বললাম, সে কি, তোর চিঠি!

—আমার অতবড় চিঠি পড়ার ধৈর্য নেই। নিকুঞ্জ উত্তর দিলে।

বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে। তাই এমন অভিমান।

আর বিয়ের দিনে খবরের কাগজে দেখলাম, মালা বিলেত যাচ্ছে ডাক্তারি পড়তে।

ভাবলাম, ভালই হল। একসময় তো ডাকটিকিটের নেশা ছিল নিকুঞ্জর, তেমনি মালাও একটা নেশা। ভুলে গেছে, কিংবা ভুলে যাবে।

কে জানত নেশা ছাড়ে না।

বিয়ের পরই ধর্মতলায় একটা দোকান খুললো নিকুঞ্জ। লাল রঙের বড় একটা সাইনবোর্ডের ওপর লেখা হল : স্ট্যাম্প এক্সচেঞ্জ।

বছর দুই পরে চাকরি নিয়ে চলে গেলাম বিশাখাপত্তন। প্রথম প্রথম দু'একটা চিঠি পেতাম নিকুঞ্জর কাছ থেকে। তারপর কখন চিঠি লেখা থেমে গিয়েছিল, নিকুঞ্জও মুছে গিয়েছিল মন থেকে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন জাহাজের কেবিনে শুয়ে শুয়ে বিদেশী পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নিকুঞ্জর ছবি দেখলাম। নীচে : এন, লাহিড়ী।

সেবার একমাসের ছুটি পেয়ে তাই চলে এলাম কলকাতায়। এসে দেখি নিকুঞ্জর দোকানটা অনেক বড় হয়েছে, সাহেবসুবোদের ছেলেমেয়ের ভিড় সব সময়। আর সাইনবোর্ডটা বদলে গেছে। স্ট্যাম্প এক্সচেঞ্জের নীচে লেখা হয়েছে—প্রোপ্রাইটর এন, লাহিড়ী, ওয়ার্ল্ড রিনাউন্‌ড্‌ ফিলাটেলিস্ট।

ভেতরে ঢুকে কিন্তু নিকুঞ্জব দেখা পেলাম না। কর্মচারীকে জিগ্যেস করতেই সে হেসে বললে, লাহিড়ী সাহেব তো এখানে নেই। তিনি বরোদায় গেছেন ; মহারাজার এলবাম তৈরি কবে দিতে।

—কবে ফিরবে ?

উত্তর এল, ফিরবেন দিন তুই পরে, কিন্তু তারপর যাবেন ভোপাল স্টেটে, কিছু ডাকটিকিট নিলাম হবে, কিনতে যাবেন উনি।

ফিরে এলাম সেদিন, খোঁজ নিতে গেলাম ঠিক তু'দিন পরেই।

গিয়ে দেখি একটা এলবাম খুলে কোন একটা স্ট্যাম্পের ওপর আতশ কাঁচ ধবে কি যেন পবীক্ষা কবছে ও।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম। চেহাবা বদলে গেছে একেবারে, পুরোদস্তুর সাহেবী পোশাক, হাবভাব। মাথায় চওড়া টাক।

আমাকে দেখে প্রথমটা চমকে উঠেছিল, তারপর একমুখ হেসে বললে, জাহাজেই চাকরি করছিস এখনো ?

বললাম, হ্যাঁ। দে না অন্য চাকরি, ছেড়ে চলে আসি।

নিকুঞ্জ হেসে বললে, চাকরি করে কি হবে, ব্যবসা কর। তোরা তো জাহাজে ঘোরাফেরা করিস, তেমন তেমন স্ট্যাম্প যদি দেখতে পাস কোন চিঠিতে তা'হলে আমাকে পাঠিয়ে দিবি, দাম দেব ভাল।

বললাম, একটা ডাকটিকিটের দাম আর কত হবে ?

—কি বলছিস ? নিকুঞ্জ চোখ কপালে তুলল। বললে, 'পোস্ট অফিস মরিসাস' টিকিটের দাম কত জানিস ? ষোলশো পাউণ্ড। মাত্র ছাব্বিশটা এ টিকিট আছে পৃথিবীতে—দাম এক লক্ষ পাউণ্ড।

লাল রঙে ছাপা ভিক্টোরিয়ার ছবি।

বললাম, এ টিকিটই বুঝি সবচেয়ে দামী ?

নিকুঞ্জ হাসল।—কি যে বলিস, বৃটিশ গায়নার এক সেণ্টের একখানা টিকিট আছে, তার দাম ৩২,৫০০ ডলার। পৃথিবীতে একটা টিকিটের দাম এর চেয়ে বেশি কেউ দেয়নি।

বললাম, কে কিনেছিল এত দাম দিয়ে।

নিকুঞ্জ বললে, ইটালির কাউ ফেরারির নাম শুনেছিস ? স্ট্যাম্প কালেক্টর নাম্বার ওয়ান—সে কিনেছিল।

অন্যমনস্কভাবে টেবিলে রাখা এলবামটার পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, আর নিকুঞ্জ অনর্গল বকে যাচ্ছিল। ভারতে ডাকটিকিট প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৮৫০ সালে, কর্নেল ফর্বেস ছেপেছিলেন কলকাতায়, রানীর মুকুট উল্টো ছাপা হওয়া একখানা টিকিটের দাম নাকি দশ হাজার পাউণ্ড। প্যারাগুয়ে আর বলিভিয়ার মধ্যে নাকি যুদ্ধ বেধেছিল ডাকটিকিট নিয়ে—এমনি সব বিচিত্র জ্ঞান নিয়ে ফিরে এলাম সেদিন।

যেদিনই যেতাম সারাটা দিন কেবল ডাকটিকিটের গল্প শুনতে হত, আর সে গল্প বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠত নিকুঞ্জ।

কিন্তু ডাকটিকিটের গল্প শোনার জন্যে তো আমি যেতাম না। শুধু দু'টো ব্যাপার আমার কাছে রহস্য মনে হত। অথচ প্রশ্ন করতেও কেমন কেমন বাধো বাধো ঠেকত। কিছুতেই মুখ ফুটে জিগ্যেস করতে পারতাম না।

একটা দিনের কথা মনে আছে। ওর দোকানে বসে আছি, একজন পিওন এসে একরাশ চিঠি রেখে গেল নিকুঞ্জর সামনে। সেই দিনের ডাক। চিঠি তো কম আসত না ওর কাছে, সারা পৃথিবী ছড়িয়ে ছিল ওর ব্যবসা।

নিকুঞ্জ কিন্তু একটা খামও না খুলে আতশ কাঁচ রেখে একটার পর একটা স্ট্যাম্প পরীক্ষা করে গেল। তারপর একটা সাদা খামের ওপর আঁটা বিদেশী স্ট্যাম্পের ওপর হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল ও।

বললে, দেখছিস ? রানীর মুখের নীচে নক্সাটা সবুজ কালিতে ছাপা। লাল হওয়া উচিত ছিল। নির্ঘাত একটা এরর টিকিট।

বলে আরো ভাল করে পরীক্ষা করতে শুরু করল নিকুঞ্জ।

আর আমি খামের ওপর চোখ বুলিয়ে বিস্মিত হলাম।

ডাকটিকিট নয়, আমি দেখছিলাম খামের ওপর সুন্দর ছাঁদের লেখা গোটা গোটা হরফের অক্ষরগুলো। চমকে উঠলাম। এ হাতের অক্ষর যে আমার অনেক চেনা, আব আমার চেয়েও এ হরফ বেশি চেনে নিকুঞ্জ নিজে।

বললাম, হাতের লেখাটা দেখেছিস ?

নিকুঞ্জ তার ওপর একবার চোখ বুলিয়েই আবার আতশ কাঁচটা ধরল ডাকটিকিটের ওপর। শুধু বললে, হাতের লেখা জোগাড় করা বুঝি তোর হবি ?

বললাম, কি বলছিস। কার হাতের লেখা দেখেছিস, কার চিঠি ? মালার না ?

—মালা ? নিকুঞ্জ আমার মুখের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন নামটা ও প্রথম শুনছে।

বললাম, মালা, মালা। মালাকে ভুলে গেছিস ?

এতক্ষণে হাসল নিকুঞ্জ। তাচ্ছিল্যের হাসি। বললে, সে-সব

কবে ভুলে গেছি। আমি হলাম ম্যান অফ বিজ্নেস। ও সব রোমান্টিক আইডিয়া কি আর এ বয়সে থাকে ?

তা ঠিক। কত যুগ পার হয়ে গেছে, এখনও কি আর সে-কথা মনে রাখবার।

নিকুঞ্জর হাবভাব দেখেও তাই মনে হল। এমন সাবধানে ব্লেড দিয়ে চিঠিটা খুলল সে, যেন চিঠি নষ্ট হলে ক্ষতি নেই, ডাকটিকিটটা যেন নষ্ট না হয়।

চিঠিটা পড়ল। হেসে বলল, পাগল! ভেবেছে এখনও বুঝি তার স্মৃতি পুষে রেখেছি।

বলেই উঠে দাঁড়াল। কোথায় যেন জরুরী কাজ আছে, কোন একটা মিশনারী ইস্কুলে ডাকটিকিটের প্রদর্শনী আছে।

বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

তারপর ছুটি ফুরোতে আবার চলে গিয়েছিলাম কলকাতা ছেড়ে। নিকুঞ্জর কথা ভুলে গিয়েছিলাম, নিকুঞ্জর সেই ডাকটিকিটের দোকানটার কথা।

বছর কয়েক পরে কলকাতায় আবার ফিরে এসেই প্রথম মনে পড়ল নিকুঞ্জকে। বোধহয় ধর্মতলা হয়ে বাসটা যাচ্ছিল বলেই দোকানটার কথা মনে পড়ল।

হুড়মুড় করে নেমে পড়লাম। খুঁজলাম।

কই সে দোকানটা দেখছি না তো। সাইনবোর্ডটাও নেই। একটা তামাকের দোকান হয়েছে সেখানে।

গিয়ে জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা, এখানে যে স্ট্যাম্প এক্সচেঞ্জ বলে দোকানটা ছিল···

হাসল দোকানদার।—সে অনেক কাল উঠে গেছে।

—উঠে গেছে ?

—হ্যাঁ। নিকুঞ্জবাবুই তো মালিক ছিলেন, হঠাৎ চলে গেলেন

একদিন সন্ধ্যের সময় দোকান খুলে রেখেই, আর কিছুই জানা গেল না।

—কোথায় গেলেন ?

দোকানদার বিরক্ত হল। বললে, কি জানি মশাই। কেউ বলে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, কেউ বলে সুইসাইড করেছেন। আবাব কেউ বলে কোন একটা মেয়ের খপ্পরে পড়ে···

উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম, স্ত্রী ছেলে মেয়ে ?···

হাসল দোকানদাব। —তাদেবই তো ছিল দোকানটা, চালাতে না পেরে বিক্রী কবে দিল।

চলে আসছিলাম গভীব দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে। সন্ন্যাসী হয়েছে নিকুঞ্জ ? সুইসাইড কবেছে ? প্রেমে পড়েছে আবাব ?

চলে আসতে আসতে ফিবে দাঁড়ালাম।—কতদিন আগে বলতে পারেন ?

দোকানদাব তাকাল আমার মুখের দিকে, তাবপর বললে ; বছর তিনেক হল। বলে গিয়েছিলেন, কোন একটা ইস্কুলে স্ট্যাম্পেব একজিবিশন আছে।

চমকে উঠলাম।

সে কি ? সেই যে আমার সঙ্গে বেবিয়ে গেল নিকুঞ্জ। তাবপর আর ফিরে আসে নি ?

বিস্মিত হলাম, তাব চেয়েও বেশি বিস্মিত হলাম যখন মনে পড়ল, সেদিনই মালার চিঠি এসেছিল তার কাছে।